মূল গাছকে মাটিতে ধরে রাখা আর জলশোষণ ছাড়াও আরও অন্যান্য কাজ করে। আগের পাতার ছবিগুলো দেখে বলো তো, কোন মূল কী ধরনের কাজ করে? কোনো কোনো মূল একের বেশিরকম কাজ করতে পারে। প্রথম স্তম্ভের কথার সঙ্গে দ্বিতীয় স্তম্ভের কথার মিলিয়ে মিলিয়ে তৃতীয় স্তম্ভে লিখে ফেলো দেখি।

মূলের নাম	কাজ	মিলিয়ে লেখো
1. বটগাছের ডালের মূল	a) বংশবিস্তার করা	2 & a
2. পাথরকুচি পাতার মূল	b) মাটির ওপর থেকে শ্বাস নেওয়া	
3. সুন্দরী গাছের মূল	c) গাছকে ঠেস দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে	
4. রাস্নার (অর্কিড) মূল	d) খাদ্য সঞ্চয় করা	
5. গজপিপুলের ডাঁটার মূল	e) অন্য গাছকে আঁকড়ে ওপরে ওঠা	
6. কেয়ার কাণ্ডের নীচের দিকের মূল	f) বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প নেওয়া	
7. মুলো		

মূল আমাদের রোজকার জীবনে কী কী কাজে লাগে? এসো দেখি।

1. পুকুর বা নদীর পাড়ে গাছ লাগানো হয়, কেন বলতে পারো?
2. গাছ না-লাগানো, না-বাঁধানো পুকুর পাড় ভেঙে যায় কেন?
3. মাটির ক্ষয় রোধে গাছ লাগানোর এরকম আর কোন কোন উদাহরণ তুমি জানো?

   (a) (b) (c) সমুদ্রের তীরে (d)

4. এইরকম কোন কোন গাছ লাগানো যেতে পারে?
5. বন্যাপ্রবণ ও ঝঞ্ঝাপ্রবণ অঞ্চলে নদীর ধার বরাবর আর পাহাড়ের ঢালে কোন কোন গাছ লাগানো দরকার?
6. মরূভূমির বিস্তার কীভাবে রোধ করা যেতে পারে?
7. কোন কোন গাছের মূল মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে? এগুলো বাজারে কখন মেলে?
8. অন্য কোন কোন প্রাণী গাছের মূল খায়?
9. কোন কোন গাছের মূল থেকে আমরা ওষুধ পাই? কোন কোন রোগে তা ব্যবহৃত হয়?

   (a) (b)

10. (i) কোন কোন জীব অন্য গাছের মূলে বসবাস করে?

    (a) মটর গাছের মূলে রাইজোবিয়াম নামক অণুজীব (b) পাইন জাতীয় গাছের মূলে ছত্রাক (মাইকোরাইজা)

    (ii) এতে গাছের কী সুবিধা?

    (a) (b)

রাস্তার পাশে ঘাসহীন, গাছহীন খোলা মাটি আর বাগানের/নদীর পাড়ে/পার্কে গাছের ছায়ায় থাকা মাটির তুলনা করো।

মাটিটা কেমন	গাছহীন মাটি	গাছওয়ালা মাটি
মাটিটা খুব শক্ত না নরম		
মাটিতে ছিদ্র বেশি না কম		
মাটিতে কতরকম ছোটো ছোটো প্রাণী আছে		
মাটি কি ঝুরঝুরে না ঝুরঝুরে নয়		
মাটি ভিজে না শুকনো		
মাটিটা খুব গরম না ঠান্ডা ঠান্ডা (দুপুরবেলা)		

এ থেকে তোমার কী মনে হয়, গাছের মূল মাটিকে কী কী ভাবে প্রভাবিত করতে পারে?

1. 2. 3. 4.

কাণ্ড

পেঁয়াজ ও আখের ক্ষেত্রে যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখেছ সেগুলো লেখো।

শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীকে দলে ভাগ করে প্রতিটি দলকে একটি করে মূলসহ শাখাপ্রশাখা আছে এমন গাছ নিয়ে আসতে বলবেন ও ছাত্রছাত্রীদের দল বিভাজন করে বসাবেন।

তোমার সবাই গাছ দেখেছ। মাটির ওপরে গাছের কী কী অংশ থাকে?

তোমার আনা গাছটার মাটির ওপরের অংশের একটা ছবি নীচে দেখো, আর তার নানা অংশ চিহ্নিত করো।

এবার এসো নীচের তালিকাটি পূরণ করি:

1. গাছটির বড়ো ডালগুলি গাছটার কোন অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে?
2. এর গায়ে যেখানে ডালগুলি যুক্ত সেখানটা কেমন দেখতে? (রং, দাগ, উঁচু বা নীচু জায়গা ইত্যাদি)
3. এইরকম দুটি জায়গার মাঝখানটি কেমন দেখতে? তার নাম কী?
4. পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদির সঙ্গে গাছের কোথায় যোগ থাকে?
5. পাতা আর কাণ্ডের মধ্যে কীরকম জ্যামিতিক আকার তৈরি হয়?

টুকরো কথা

কাণ্ডের যেখান থেকে শাখাগুলো বেরিয়েছে তাকে বলে পর্ব বা নোড (Node)। আর দুটি পর্বের মাঝখানের জায়গাটা হলো পর্বমধ্য (Internode)। পাতা আর কাণ্ডের মাঝে যে কোণ তৈরি হয় তাকে কক্ষ বা অ্যাক্সিল (Axil) বলে। আর মাটির ওপরে কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা বা ডালপালা, পাতা, ফুল, ফল নিয়ে গাছের যে অংশ তাকে বিটপ (Shoot) বলে।

তাহলে গাছের মাটির ওপরে কী কী অংশের নাম জানলাম ?

1. ...., 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....

তুমি যতরকম গাছ দেখেছ তার সবগুলিই কি একরকম দেখতে ? এসো তুলনা করি।

বৈশিষ্ট্য	আম	দেবদারু	নারকেল	বাঁশ
1. গুঁড়ি (কাণ্ডের গোড়ার দিকের মোটা কাষ্ঠল কাণ্ড) আছে কি ?				
2. থাকলে কীরকম (মোটা/সরু)				
3. গুঁড়ির গা কেমন ? (মসৃণ/এবড়োখেবড়ো)				
4. শাখা আছে কিনা ?				
5. বিটপের আকৃতি কেমন ?				
6. কাণ্ড নিরেট না ফাঁপা ?				

তোমার দেখা সব গাছগুলি সমান উঁচু নয়; এসো তাদের চিনি।

গাছগুলির নাম লেখো :

1. কোন গাছটি কতটা উঁচু ?
2. কোন গাছ বাতাসে বেশি হেলে পড়ে ?

3. কোন গাছের কাণ্ড আর ডাল বেশি শক্ত আর শুকনো?
4. কোনো গাছের ডালপালা মাটির কত উপর থেকে বেরোয়?
5. কতদিন বাঁচে?
6. কোন গাছের প্রকৃতি কেমন? (যেমন, আম - বৃক্ষ, জবা - গুল্ম, ধান - বীরুৎ)

তোমার দেখা কী কী গাছ মাটিতে সোজা দাঁড়াতে পারে না?

1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....

এসো দেখি ওপরের গাছগুলি কী কী রকমের হয়?

1. কাণ্ডের পর্ব থেকে মূল তৈরি হয়ে মাটিতে প্রবেশ করে কিনা?
2. কাণ্ডটা মাটিতে শুয়ে থাকে কিনা?
3. কাণ্ড শক্ত কিছু বেয়ে ওঠে কিনা?

বলো তো নীচের গাছগুলি দেহের কোন কোন অঙ্গ দিয়ে কোনো কিছু বেয়ে ওপরে ওঠে?

গাছের নাম	অঙ্গের নাম
1. লাউ গাছ	a) কাণ্ডের পর্ব থেকে বেরোনো মূল
2. মটর গাছ	b) ডাল থেকে বেরোনো আঁকশি
3. অপরাজিতা	c) পাতা থেকে তৈরি হওয়া আঁকশি
	d) কাণ্ড

নীচে দেওয়া তোমার রোজকার চেনা জিনিসগুলোর মধ্যে কোনটা কাণ্ড, কোনটা নয় বলো তো? [প্রয়োজনে বাজারে গিয়ে সবজি বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলো।]

চেনা জিনিস	কাণ্ড	কাণ্ড নয়	আকৃতি কেমন
ডাঁটাশাক			
বাঁধাকপি			
সজনেডাঁটা			
আলু			
কচু			

কিছু কিছু গাছের কাণ্ড আমাদের ঠিক চেনা কাণ্ডের মতো নয়। নিজেদের সুবিধার জন্য সেই সমস্ত গাছগুলো তাদের কাণ্ডগুলোকে পালটে ফেলেছে। এরকম পালটে যাওয়া কাণ্ডগুলোকে আমরা বলি - **রূপান্তরিত কাণ্ড** (Modified Shoot)। আমরা যে আলু খাই সেটা আলুগাছের পালটে যাওয়া কাণ্ড যার মধ্যে তার ভবিষ্যতের খাদ্য সে সঞ্চয় করে রাখে। নীচের ছবিগুলোতে গাছের কাণ্ডের কোন অংশ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা নীচে দেখো আর লেখো।

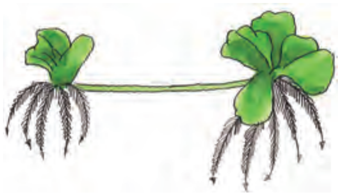

1. .... 2. .... 3. রূপান্তরিত মৃদগত কাণ্ড 4. ....

এসো এবার এইসব কাণ্ডের কয়েকটি সম্পর্কে ভালো করে জানি:

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	কোনরকম কাণ্ড	কেমন দেখতে	কাজ কী
1.	বেলের শাখাকন্টক	রূপান্তরিত বায়বীয় কাণ্ড : কাণ্ড শাখা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়েছে।	লম্বা, ধারালো কাঁটার মতো	আত্মরক্ষা করা
2.	কচুরিপানার খর্ব-ধাবক	রূপান্তরিত অর্ধবায়বীয় কাণ্ড		
3.	আলুর স্ফীত কন্দ	রূপান্তরিত মৃদগত কাণ্ড		
4.	কুমড়োর শাখা-আকর্ষ	রূপান্তরিত বায়বীয় কাণ্ড		

এসো এবার গাছের দিনরাত কীভাবে কাটে খোঁজ নিই :

★ গাছ তার পাতায় খাবার বানায়। তার জলটা তোলে মূল দিয়ে। সেই জলটা কোন পথে পাতায় পৌঁছোয় ? ----------------------------

★ পাতায় তৈরি খাবারটা গাছের নীচমহলে পৌঁছোয়ই বা কোন পথে? ---------------------।

★ গাছের বাড়তি খাবারটা গাছ কোথায় জমা রাখে ----------------------।

★ গাছ চারপাশের ডালপালাগুলোকে মেলে ধরে; পাতাগুলোকে রোদে মেলে রাখে। গাছের কোন অংশটি ডাল, পাতা, ফুল আর ফল ধরে রাখে -----------------------।

★ তৃণভোজী পশুরা গাছকে খেতে এলে, কোন অংশটা দিয়ে গাছ নিজেকে বাঁচায় ----------।

★ চড়া রোদে যখন মাটি থেকে কষ্ট করে তোলা জল পাতা থেকে বাষ্প হয়ে যেতে থাকে। তখন গাছের কাণ্ডের গায়ের মোমের আবরণ তা ঠেকায়। এখানে কাণ্ডের ভূমিকা কী? ....

★ বাঁশগাছ, কলাগাছ, পাম এসব গাছ ফুল না ফুটিয়ে, বীজ না তৈরি করেও কাণ্ডের সাহায্যে পৃথিবীতে তাদের বংশধরদের রেখে যায়। এখানে কাণ্ডের ভূমিকা কী? ....

★ পুঁইশাক, লাউশাক এরা পাতা ছাড়াও আর কোন অঙ্গের সাহায্যে খাদ্য তৈরি করতে পারে? এখানে কাণ্ডের ভূমিকা কী? ....

তাহলে আমরা গাছের কাণ্ডের কোন কোন কাজের কথা জানলাম? নীচে লিখি।

1. জল বয়ে নিয়ে যাওয়া 2. 3. খাদ্যসঞ্চয় 4.

5. 6.

গাছের গায়ে ওই সবুজ ছোপগুলো হলো লাইকেন। বাতাস দূষণমুক্ত থাকলে লাইকেনের রং থাকে সবুজ। বাতাস বেশি দূষিত হলে লাইকেনের রং বদলে খয়েরি হয়ে যায়।

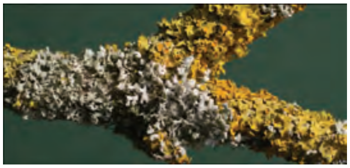

আমাদের সারাদিনে গাছের কাণ্ড কোন কোন কাজে প্রয়োজন হয়?

1. তোমার বাড়িতে কোন কোন কাজে কাঠ লেগেছে?
2. তুমি যে কাগজে লেখো, তা কী থেকে তৈরি?
3. বলো তো কোন কোন যান তৈরিতে কাঠ ব্যবহার হয়?
4. তোমার বাড়িতে রান্না করতে গাছ কী কী ভাবে কাজে লাগতে পারে?
5. কোন কোন গাছের কাণ্ড তুমি খাবার হিসাবে খাও?
6. তোমার সুতির পোশাক, চটের বস্তা কী থেকে তৈরি?
7. গাছের কী কী অংশ আঠা, মশা তাড়ানোর ধুনো, সাইকেলের টায়ার আর কাঠের পালিশ তৈরিতে কাজে লাগতে পারে?
8. দু-একটা ওষুধের নাম লেখো যা গাছের কাণ্ড থেকে পাওয়া যায়?

আর পরিবেশেই বা গাছের কাণ্ড কী ভূমিকা নেয়—

1. রাতে পাখি, কাঠবেড়ালি, বাদুড়, বানর এরা কোথায় আশ্রয় নেয়?
2. গাছে থাকে এমন কয়েকটি পোকামাকড়ের নাম লেখো।
3. তোমার দরকারি অক্সিজেন কে বাতাসে ছেড়ে দেয়? আর তোমার ছেড়ে দেওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড কে টেনে নেয়?
4. গরমকালে গাছের নীচে দাঁড়ালে ঠান্ডা বোধ হয় কেন?
5. গাড়ির ধোঁয়ার নানা বিষাক্ত গ্যাস টেনে নিয়ে বাতাসকে নির্মল রাখে কে?
6. জানো কি, গাছের গুঁড়ি দেখে পরিবেশ দূষিত কিনা কীভাবে বুঝবে?
7. জানো কি, গাছের কাটা গুঁড়ি দেখে গাছের বয়স বলা যায় কীভাবে?

পাতা

তোমরা স্কুলে যাওয়ার পথে যেসব পাতা দেখো, তার কয়েকটির ছবি নীচে দেওয়া আছে।

1

2

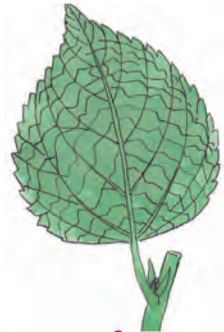

3

4

5

কোনটা কোন গাছের পাতা তার নাম লেখো:

1. ---------   2. ------------ 3. --------------- 4. ----------- 5. ....``

এবার তুমি পাতাগুলো সংগ্রহ করে পাতাগুলোর চওড়া প্রসারিত অংশের আকারগুলো বোঝার চেষ্টা করো এবং নীচে তার ছবি আঁকো।

নমুনা পাতার নাম	নমুনা পাতার প্রসারিত চ্যাপটা অংশের আকার
1. ঝাউপাতা 2. বাঁশপাতা 3. জবাপাতা 4. পদ্মপাতা 5. ছাতিমপাতা	

উপরের প্রত্যেকটি গাছের পাতার যে প্রসারিত ও চ্যাপটা অংশের আকারের সঙ্গে তুমি পরিচিত হলে তাহল পাতার ফলক (Lamina)। আর পাতার গোড়ায় যে সরু ডাঁটির মতো থাকে সেটি পাতার বোঁটা। তবে সব গাছের পাতার বোঁটা নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে পাতার ফলক সরাসরি কাণ্ড থেকে বের হয়।

তুমি/তোমরা লেবু, ঘৃতকুমারী ও অশ্বত্থ গাছের পাতা সংগ্রহ করো।

এর মধ্যে -

a. কোন পাতার ফলক ছিঁড়লে মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়? .... ।

b. কোন গাছের পাতার ফলক ছিঁড়লে টপটপ করে রস গড়িয়ে পড়ে? .... ।

c. কোন গাছের পাতা চামড়ার মতো পুরু ? .... ।

ওপরের বৈশিষ্ট্যযুক্ত এরকম আরও তিনটি পাতা খুঁজে বার করো।

ক্রমিক নং	মিষ্টি গন্ধের পাতা	রসালো পাতা	চামড়ার মতো পাতা
1.			
2.			
3.			

পাশের গাঁদা গাছের পাতার ধার খণ্ড খণ্ড। আর অশ্বত্থ গাছের পাতার ধার মসৃণ, কোনো খণ্ড নেই।

এরকম অখণ্ড বা খণ্ডিত ফলকপ্রান্ত যুক্ত দুটি করে পাতার নাম লেখো .... ।

তোমরা প্রত্যেকে একটা করে জবা পাতা ও কলাপাতা নিয়ে আলোর দিকে ধরে দেখো তো এরকম দেখো তো পাচ্ছ কিনা —

(i) জবাপাতা — মাঝখানে একটা শিরা, এই শিরার দু-পাশ থেকে অনেকগুলো শিরা বেরিয়েছে। শিরাগুলো সব মিলে একটা জালের মতো তৈরি করেছে।

(ii) কলাপাতা — মাঝখানে একটা শিরা, মাঝখানের শিরার দু-পাশ থেকে সমান্তরালভাবে অনেকগুলো শিরা বেরিয়েছে।

পরের পাতার ছবিগুলো লক্ষ করো। দেখো তো পত্রবৃন্ত কীভাবে কাণ্ডের পর্বের সঙ্গে যুক্ত থাকে?

1. জবাগাছের পাতায় .... 2. আকন্দগাছের পাতায় .... 3. শালুকগাছের পাতায় ....

পাতার যে গঠনটি পত্রবৃন্তকে কাণ্ডের পর্বের সঙ্গে যুক্ত করে তার নাম হলো পত্রমূল (Leaf base)।

জবাপাতার ছবিতে পাতার বিভিন্ন গঠনগত অংশ চিহ্নিত করো।

পাতার বিভিন্ন অংশ কী কী কাজ করে? নীচের সারণির বামদিকের সঙ্গে ডানদিকের স্তম্ভের সাদৃশ্য বিধান করো:(একই অংশ একাধিক কাজ করতে পারে)

পাতার অংশ	কাজ
1. পত্রফলক	(a) খাদ্য প্রস্তুত করা।
2. পত্রবৃন্ত	(b) জল ও খাদ্য পরিবহণ করা।
3. পত্রমূল	(c) পত্রফলককে ধরে রাখা ।
	(d) গ্যাসের আদানপ্রদান করা।
	(e) পাতাকে কাণ্ড বা শাখার সঙ্গে যুক্ত করা।

নীচের ছবিগুলো লক্ষ করো এবং এই পাতাগুলো কোন কোন উদ্ভিদের?

1. ...., 2. ...., 3. ...., 4. ...., 5. ....

আগের পাতার পাতাগুলো খাদ্য তৈরি, বাষ্পমোচন, শ্বাসবায়ুর আদানপ্রদান ছাড়াও অন্যান্য কাজ করে। ছবিগুলো দেখে বলো তো কোন পাতা কী কাজ করে? (কোনো কোনো পাতা একের বেশি কাজ করতে পারে।)

পাতার নাম	কাজ
1. মটরের পত্রাকর্ষ	(a) বংশবিস্তার করা।
2. ফণীমনসার পত্রকন্টক	(b) খাদ্য সঞ্চয় করা।
3. ঘৃতকুমারীর পাতা	(c) পতঙ্গের দেহস্থিত নাইট্রোজেন ঘটিত উপাদান সংগ্রহ করা।
4. পাথরকুচির পাতা	(d) আরোহণে সাহায্য করা।
5. কলশপত্রীর পাতা	(e) অতিরিক্ত বাষ্পমোচনে বাধা সৃষ্টি করা।

অশ্বত্থ পাতা একটি মাত্র ফলক দিয়ে গঠিত। ফলকের ধার সম্পূর্ণ অর্থাৎ এতে কোনো খণ্ড থাকে না । এই ধরনের পাতাকে একক পত্র (Simple leaf) বলে।

তেঁতুল পাতার ফলক মাঝখানের শিরা পর্যন্ত কতগুলো আলাদা আলাদা খণ্ডে ভাগ হয়ে যায়। এইধরনের পাতাকে যৌগিক পত্র (Compound leaf) বলে।

তোমার চারপাশে দেখা এরকম তিনটি করে একক ও যৌগিক পত্রের উদাহরণ দাও।

একক পত্রযুক্ত গাছের নাম	যৌগিক পত্রযুক্ত গাছের নাম
1.	1.
2.	2.
3.	3.

পাতা জীবজগতের কী কী কাজে লাগে? এসো দেখি :

1. গাছের পাতা কোন গ্যাস বাতাসে ছাড়ে এবং কোন গ্যাস শোষণ করে?
2. মানুষের পক্ষে উপকারী পোকার নাম করো যারা গাছের পাতাকে খাবার হিসাবে খায়।
3. মানুষের পক্ষে এমন কতকগুলো অপকারী পোকার নাম করো যারা গাছের পাতাকে খাবার হিসাবে খায়।
4. হাতি, হরিণ, গোরু ও ছাগল কোন কোন গাছের পাতাকে খাবার হিসাবে খায়?
5. কোন গাছের পাতার শিরা বাড়ির ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করতে কাজে লাগে?
6. কোন কোন গাছের পাতার রস বা নির্যাস আমরা ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করি?
7. কোন কোন গাছের পাতাকে মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যবহার করে?
8. কোন কোন গাছের পাতা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়?
9. কোন কোন জীব গাছের পাতায় ডিম পাড়ে?

10. ঘরের ছাউনি বা দেয়াল তৈরিতে কোন কোন গাছের পাতা ব্যবহার করা হয়?

11. ঘর সাজানোর কাজে কোন কোন গাছের পাতা ব্যবহার করা হয়?

12. কোন কোন প্রাণী কোন কোন পাতার আকৃতি বা রং-কে অনুকরণ করে বেঁচে থাকে?

এবার এক-একটা করে পাতা নাও। স্কেল দিয়ে মেপে দেখো, পাতাটা কতটা লম্বা, কতটা চওড়া। তার দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের অনুপাত হিসেব করো। তারপর যা পেলে, তা নীচের ছকটায় লেখো।

কী ধরনের গাছ	কোন গাছের পাতা	পাতার পরিমাপ		
		দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত
ছোটো গাছ				
1.				
2.				
মাঝারি গাছ				
1.				
2. বড়ো গাছ				
1.				
2.				

ফুল

নীচের ছবিটি ভালো করে দেখো। তোমরা রোজ যে যে ফুল দেখো তার কয়েকটা নীচে দেওয়া আছে। চিনতে পারো কিনা দেখো তো।

1. ....

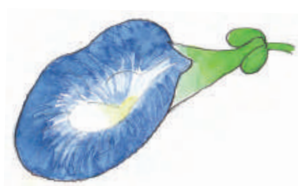

2. ....

3. ....

4. ....

এবার তুমি একটি জবাফুল নিয়ে দেখো কী কী দেখতে পাচ্ছ।

ফুলটি বাইরে থেকে ভেতরের দিকে কতকগুলো অংশ নিয়ে তৈরি। ওই অংশগুলোকে এক একটি স্তবক বলে।

1. ফুলের বোঁটার ঠিক ওপরে সবুজ রঙের একটা উলটানো ঘন্টার মতো অংশ আছে। যখন ছোটো কুঁড়ি থাকে তখন পুরো কুঁড়িটাই এটা দিয়ে ঢাকা থাকে। সবুজ ঘন্টাটা আসলে পাঁচটা ছোটো ছোটো পাতার মতো অংশ জুড়ে তৈরি। সবুজ ঘন্টার মতো এই অংশটাই ফুলের বৃতি (Calyx)। আর বৃতির প্রত্যেকটা অংশ হলো বৃত্যাংশ (Sepal)। এগুলো আলাদা থাকতে পারে আবার জুড়েও যেতে পারে।

2. বৃতির ভেতর থেকে দেখো পাঁচটা টকটকে লাল রঙের পাতলা কাগজের মতো বেরিয়েছে। এগুলো হলো পাপড়ি (Petal)। সমস্ত পাপড়ি বা দলগুলো জুড়ে তৈরি করে দলমণ্ডল (Corolla)। পাপড়িগুলো কখনো-কখনো নিজেরা জুড়ে গিয়ে বিভিন্ন আকার নেয়। কুমড়ো ফুলে এগুলো মিলে ঘন্টার মতো দেখতে হয়। আবার জবাফুলে এরা না জুড়েই থাকে। সাধারণভাবে ফুলের যে নানান রং দেখি তা এই পাপড়িরই রং। এদের সংখ্যা, রং ও গন্ধ নানা ফুলে নানারকম। এই রং আর গন্ধই বিভিন্ন রকম পোকা ও পাখিদের আকৃষ্ট করে।

3. তোমরা দেখো জবাফুলের ভেতর থেকে একটা কালচে লাল রঙের লম্বা সরু দড়ির মতো অংশ বেরিয়েছে। তার মাথায় পাঁচটি ভাগ। প্রতিটি অংশের ওপরটা ফুটকির মতো দেখতে। এই পাঁচ মাথাওয়ালা অংশটার একটু নীচে ওই সরু দড়িটার চারপাশে কিছুটা অংশে অনেকগুলো কিছু লেগে আছে বলে মনে হচ্ছে। এবার ওগুলোর একটাকে খুব সাবধানে নিয়ে দেখো তো কী কী দেখতে পাচ্ছ? একটা সরু সুতো আর তার মাথায় ঠিক বাংলা পাঁচ (৫)-এর মতো দেখতে একটা থলি। এই থলির মতো অংশটাকে বলে পরাগধানী (Anther)। আর সরু সুতোর মতো অংশটা হলো পুংদণ্ড। ভালো করে লক্ষ করে দেখো ওই থলিটার মধ্যে হলুদ রঙের পাউডারের মতো আছে। এগুলো হলো পরাগরেণু (Pollen grain)। সরু সুতো আর তার মাথায় থাকা পরাগধানীকে একসঙ্গে বলে পুংকেশর (Stamen)। জবাফুলে দেখো অনেকগুলো পুংকেশর একসঙ্গে থাকে। এদেরকে একসঙ্গে পুংকেশর চক্র (Androecium) বলে।

4. এবার খুব ধীরে ধীরে ওই সরু লাল দড়িটার ওপরের পাঁচ মাথাওয়ালা অংশটা থেকে নীচের দিকে বাইরের লাল পাতলা অংশটা ছাড়িয়ে ফেলো। ভেতরে একটা সাদা অংশ দেখতে পাবে। এবার খুব মন দিয়ে দেখো সাদা অংশটার ভেতরে একটা খুব সরু সুতোর মতো আছে। এই সুতোটার মাথায় সেই পাঁচটা মাথা আর একেবারে নীচে খুব ছোটো অনেকটা ডিমের আকারের একটা অংশ। ওই ছোটো ডিমের আকারের অংশটা হলো গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয় (Ovary)। আর এর মাথা থেকে যে সরু সুতোর মতো লম্বা অংশ বেরিয়েছে সেটি গর্ভডাঁটি বা গর্ভদণ্ড (Style)। এর মাথায় যে পাঁচটি ফুটকির মতো অংশ রয়েছে সেগুলোকে বলে গর্ভমুণ্ড (Stigma)।

গর্ভাশয়টাকে ফাটিয়ে দেখো অনেক ছোটো দানার মতো অংশ দেখতে পাবে। এগুলোকে বলে ডিম্বক (Ovule) । গর্ভাশয়, গর্ভদণ্ড আর গর্ভমুণ্ড — এদের একসঙ্গে বলে গর্ভকেশর (Carpel)। আর ফুলের সবকটা গর্ভকেশরকে একসঙ্গে বলে গর্ভকেশরচক্র (Gynoecium)। বিভিন্ন ফুল নিয়ে যদি তোমরা দেখো (মটর, বক, অপরাজিতা, কুমড়ো, জবা কিংবা ধুতুরা) তবে দেখতে পাবে সব ফুলের পুংকেশর বা গর্ভকেশর সংখ্যায় বা আকারে এক নয়। পরাগধানীর মধ্যে যে পরাগ থাকে তা গর্ভমুণ্ডে পড়ে। তারপর ডিম্বকের সঙ্গে মিলিত হলে ডিম্বাশয় ফলে ও ডিম্বক বীজে পরিণত হয়।

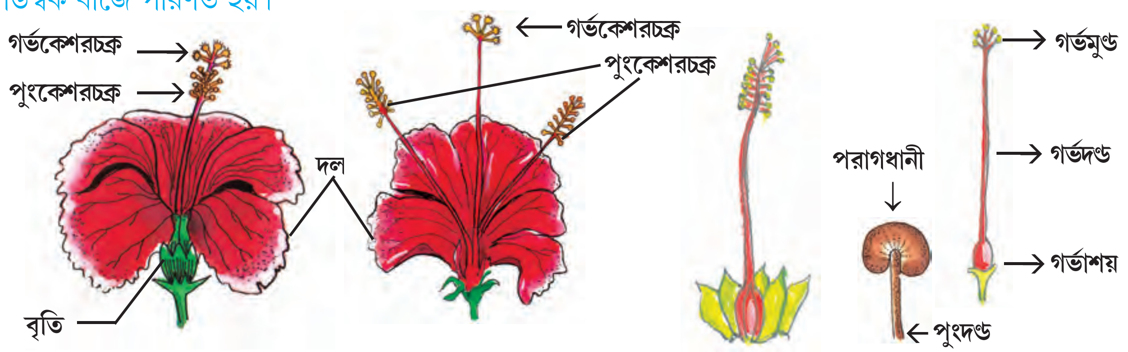

জবা ফুলের গঠনে প্রধান যে চারটি অংশ পাওয়া গেল তাদের নাম হলো:

1. 2. 3. 4.

এর মধ্যে, (a) কোনগুলি গাছের বংশবৃদ্ধিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করে? ...., ... ।

(b) কোনগুলি অন্যান্য স্তবকগুলোর কাজে সাহায্য করে? ...., ... ।

ওপরে বিভিন্ন ফুল ও ফুলের অংশের ছবি দেওয়া আছে। ফুলগুলো জোগাড় করে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

1. কোন ফুলের বৃতি বা দলমণ্ডলের অংশগুলোর আকৃতি বা গঠন সমান (মেপে দেখো)? .... ।
2. কোন ফুলের বৃতি বা দলমণ্ডলের অংশগুলো পরস্পর সমান নয়? .... ।
3. কোন কোন ফুলে চারটি স্তবকই উপস্থিত? .... ।
4. কোন কোন ফুলে একটি বা একাধিক স্তবক অনুপস্থিত ? .... ।
5. কোন ফুলের কোন কোন স্তবক অনুপস্থিত ? .... ।

ফুল সম্পর্কে এসো আমরা আরও কিছু বিষয় জানার চেষ্টা করি :

1. পাতার রং সবুজ কিন্তু ফুলের পাপড়ি রঙিন হয় কেন?
2. একই ফুলের পাপড়ির রং কি (উচ্চতা, দিন-রাত, ঋতুভেদে) বদলাতে পারে?
3. কোনো ফুলের পাপড়ির রং কোথাও লাল, কোথাও হলুদ, কোথাও বেগুনি বা কোথাও নীল হয় কেন?
4. ফুলের পাপড়িতে গন্ধ থাকলে গাছের কী সুবিধা হয়?
5. রাতে বা দিনে কোন কোন ফুল ফোটে?
6. কোনো ফুলের পরাগ কি কোনো প্রাণী খাদ্য হিসাবে খাদ্য গ্রহণ করে?
7. ফুলের পরাগ মানবদেহে প্রবেশ করলে কী কী সমস্যা হতে পারে?
8. ফুলের পাপড়ির রং- কে মানুষ কী কী কাজে ব্যবহার করে?
9. সূর্যের আলোর সঙ্গে ফুল ফোটার সম্পর্ক কী?
10. ফুলের কোন অংশটি থেকে ফল তৈরি হয়?

ফল

হরেক ফলের ঝুড়ি

তুমি তো নিশ্চয়ই নানারকমের ফল দেখেছ। তোমার চেনা কয়েকটি ফলের নাম লেখো যারা নীচের বৈশিষ্ট্যগুলো যুক্ত :

এমন দুটো ফল, যেগুলো খুব রসালো, আর পাকলে ভারি মিষ্টি।	
এমন দুটো ফল, যেগুলো খুব রসালো, কিন্তু পাকলেও ভারি টক।	
এমন দুটো ফল, যেগুলো খুব রসালো, আর পাকলে ভারি কষাটে।	
এমন দুটো ফল, যেগুলো কাঁচা অবস্থায় সবজি হিসেবে খাওয়া হয়, আর পাকলে ফল হিসেবেও খাওয়া যায়।	
এমন দুটো ফল, যেগুলো কাঁচা অবস্থায় সবজি হিসেবে খাওয়া হয়, কিন্তু পাকলে ফল হিসেবে খাওয়া যায় না।	
এমন দুটো ফল, যেগুলো রসালো নয়, কিন্তু খাওয়া হয়।	

ফলের একাল-সেকাল

তোমার বাবা, মা, দাদু বা দিদিমাকে জিজ্ঞেস করো তো, তাঁরা কে কী ফল খেতেন?	
দেখো তো, তাঁরা এমন কোন ফল খেতেন, যা তুমি খাওনি, অথবা যা এখন পাওয়া যায় না?	
না খেলে কেন খাওনি?	
না পাওয়া গেলে, কেন পাওয়া যায় না?	
তাঁরা যেসব ফল খেতেন, সেগুলো তখন যেমন দেখতে ছিল, এখন কি তেমনটিই আছে, নাকি অন্যরকম দেখতে হয়েছে?	
দেখো তো এমন কোন ফল তাঁরা খাননি, কিন্তু তুমি খেয়েছ?	
কেন এমন হলো?	

ফলের অন্দরমহল

এসো, ফলের ভেতরে কী আছে দেখি। তোমার লাগবে: একটা ছোটো কাঁচা আম আর একটা ছুরি।

কাজ	তোমার উত্তর
প্রথমে ছুরি দিয়ে আমটাকে লম্বালম্বি এমনভাবে কাটো যেন আঁটিটা কেটে না যায়। কাটার সময়ে ছুরিটাকে সাবধানে ব্যবহার করবে, যাতে হাত না কাটে। দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমাকে সাহায্য করবেন। কাটতে গিয়ে ফলটাকে কেমন মনে হলো, শক্ত না নরম? কাটার সময়ে ফলটা থেকে কী বেরিয়েছে?	
এবার ফলটার কাটা পাশটা ভালো করে লক্ষ করো (দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমাকে সাহায্য করবেন।) ফলটার বাইরে থেকে ভেতরে কটা ভাগ দেখতে পাচ্ছ? ভাগগুলোর নাম লেখো।	
ফলের ঠিক মাঝখানটায় কী দেখতে পাচ্ছ?	
ফলের মাঝখানের অংশটা ছুরি দিয়ে খুব সাবধানে কেটে দেখার চেষ্টা করো ভেতরে কী আছে?	
কাটা ফলটা যেমন দেখছ, তেমন করে পাশের খোপে আঁকো। তারপর বিভিন্ন অংশগুলো চিহ্নিত করো।	

এবারে এসো, ফলটা কাটার পর ফলটার বাইরে থেকে ভেতরে যেতে পরপর যে পাঁচটা ভাগ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোর কথা লিখি ঃ

1. প্রথম ভাগ	
2. দ্বিতীয় ভাগ	
3. তৃতীয় ভাগ	
4. চতুর্থ ভাগ	
5. পঞ্চম ভাগ	

একটি ফলের গঠন :

আম একটি বোঁটাযুক্ত রসালো ফল। একটি ফুল থেকে একটিমাত্র ফল গঠিত হয় বলে এটি একটি সরল ফল (Simple fruit)।

আমের গঠনে দুটি অংশ দেখা যায় — (a) পেরিকার্প বা ফলত্বক (b) বীজ।

(A) ফলত্বক - ডিম্বাশয়ের আবরণীত্বক থেকে ফলত্বক গঠিত হয়। ফলত্বকের তিনটি স্তর থাকে।

(i) বহিঃত্বক - পাতলা চামড়ার মতো। কাঁচা অবস্থায় এর রং সবুজ ও পাকলে এটি হলুদ বা লালাভ রং-এর হয়। এটিকেই আমরা খোসা বলে থাকি।

(ii) মধ্যত্বক - এটি রসালো ও শাঁসযুক্ত। আমের এই অংশই আমরা খেয়ে থাকি।

(iii) অন্তঃত্বক - এটি কঠিন। আমরা একে আঁটি বলি। এটি বীজকে ঢেকে রাখে। তাই বীজ বাইরে থেকে দেখা যায় না।

(B) আমের বীজ দুটি বীজপত্র নিয়ে গঠিত।

- আমের মধ্যত্বক রসালো শাঁসযুক্ত। তাই আম .... ফল। (সরস/নীরস)
- আমের বীজে .... বীজপত্র থাকে। তাই আমগাছ .... উদ্ভিদ।

ফলের হরেকরকম

তোমরা এর মধ্যে আমের গঠন দেখেছ। আর কী কী রকম ফল হয়?

একটা করে আম, আতা, (পাকা) আর এঁচোড় (ছোটো মতো) জোগাড় করো। এবার এসো এদের মিলিয়ে দেখি :

	আম	আতা	এঁচোড়
ফলটাকে একটু জোরে চাপ দিয়ে দেখো, কী হয়			
ফলটাকে কেটে ভেতর দেখো, কতগুলো বীজ দেখতে পাচ্ছ			

কোন ফলটায় দেখেছ লেখো :

ফলের বর্ণনা	ফলের নাম	ফলের প্রকৃতি	আরো উদাহরণ
একটা বোঁটা, তার ওপরে একটামাত্র অংশ, আর তাতে একটা বীজ।	আম	এই রকম ফলকে সরল ফল বলা হয়।	
একটা বোঁটা, তার ওপরে অনেকগুলো অংশ, অংশ গুলো আলাদা করা যায়, আর প্রতিটি অংশে একটা করে বীজ।	আতা	এই রকম ফলকে গুচ্ছিত ফল বলে। বলোতো, এক থোকা আঙুর কী এই ধরনের ফল? হলে, কেন? না হলেই বা কেন?	
একটা বোঁটা, তার ওপরে অনেকগুলো অংশ, অংশ গুলো আলাদা করা যায় না, আর প্রতিটি অংশে একটা করে বীজ ।	এঁচোড়	এই রকম ফলকে যৌগিক ফল বলে।	

ফলটা এল কোথা থেকে?

তোমরা দেখেছ, ফুল থেকে ফল হয়। ফুলের কোন অংশটা থেকে ফল হয়? এসো দেখি। তোমার লাগবে একটা সিম, বক বা অপরাজিতা ফুল, আর তার একটা ফল। আর ফুল কাটার জন্য লাগবে একটা আলপিন।

আগে মনে করে লেখত, ফুলের অংশগুলো কী কী?

এবার আস্তে আস্তে ফুলের অংশগুলো আলাদা করো। তারপর ফলটাকে এক-একটা অংশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো, কোনটার সঙ্গে ফলটার চেহারার মিল সবচেয়ে বেশি।

তোমার খাতায় এক একটা ঘরে ফুলের এক-একটা অংশের ছবি আঁকো	এবার ফুলের যে অংশটার সঙ্গে ফলের মিল সবচেয়ে বেশি তার পাশের খোপে ফলটার ছবি আঁকো

তাহলে ফুলের কোন অংশটি থেকে ফল তৈরি হয়? ....।

বীজ

নানা উদাহরণ

তোমার জানা যতগুলো পারো বীজের নাম লেখো। বীজগুলোর কোনটা কেমন দেখতে, আর কী কাজে লাগে তা লেখো আর ছবি এঁকে দেখাও।

বীজের নাম	কেমন দেখতে	কী কাজে লাগে	ছবি

ধান, মুগ ডাল, মুসুরি ডাল, কলাইয়ের ডাল, গোলমরিচ আর জিরে বা ধনে দিয়ে কাগজের ওপরে ছবি আঁকতে পারবে? বন্ধুরা একসঙ্গে মিলে করো তো।

ধানের গান জানো? ধানের কোনো কবিতা পড়েছ? সবাই মিলে শোনো।

বীজের ভেতরে কী আছে

চলো, বীজের ভেতরে কী আছে দেখি। তোমার লাগবে সারা রাত ভিজিয়ে রাখা মটর বীজ, বীজটা কাটার জন্য একটা আলপিন, আর একটা সাদা কাগজ।

প্রথমে গোটা বীজটা ভালো করে দেখো আর নীচের ছকে লেখো।

বীজটার আকৃতি কেমন?	
বীজটার রং কেমন?	
বীজটার ওপরে কোনো বিশেষ দাগ, ফুটো বা অন্য কিছু আছে কিনা? থাকলে তা কেমন দেখতে? ওই অংশ বা অংশগুলোর কাজ কী হতে পারে?	

এবার বীজটা কেটে দেখি (দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমায় সাহায্য করবেন।):

আলপিন দিয়ে বীজের ওপরের আবরণীটি আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে ফেলো। আবরণীটির নাম কী? এটির কটি স্তর আছে?	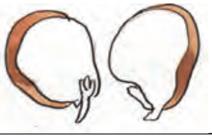
আবরণীটির ভিতরের অংশটি সরিয়ে রেখো। এবার আবরণীটিকে সাদা কাগজটির ওপরে রাখো, আর পাশের ছকে তার ছবি আঁকো। শেষে আবরণীটি কেমন দেখতে নীচে লেখো।	
তারপর আবরণীটির ভিতরের অংশটি দেখো। এর নাম কী?	
এটিকে সাবধানে সামান্য চাপ দাও; এটি কটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়?	
তারপরে এটিকে কাগজের ওপরে রাখো, আর পাশের ছকে তার একটা ছবি এঁকে চিহ্নিত করো। এবার এটি কেমন দেখতে অল্প কথায় লেখো।	

তাহলে বীজের সম্পর্কে কী কী জানলাম?

প্রথমে, বাইরের আবরণীটি:	
(a) এর নাম কী?	বীজত্বক
(b) এর রং কী?	সবুজ কিংবা হলুদ
(c) এর কটা স্তর?	দুটো
(d) স্তরগুলোর নাম কী কী?	বহিঃত্বক (Testa),অন্তঃত্বক (Tegmen)
(e) এর কাজ কী হতে পারে?	ভ্রূণসহ বীজের সমস্ত অংশকে রক্ষা করা
(f) এর ওপরে কী কী দাগ বা ফুটো দেখেছ?	দাগ- ডিম্বকনাভি (Hilum), ছিদ্র—ডিম্বকরন্ধ্র (Micropyle)
(g) তাদের কাজ কী কী?	অঙ্কুরোদগমের সময় ডিম্বকরন্ধ্রের মধ্য দিয়ে ভ্রূণমূলবেরিয়ে আসে।

তারপরে ভেতরের অংশ :

(a) এর নাম কী?	অন্তর্বীজ বা ভ্রূণ (Kernel)
(b)এর রং কী?	
(c)এর আকৃতি কেমন?	
(d)একে চাপ দিলে কটা ভাগে ভাগ হয়ে যায়?	দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়।
(e) ভাগগুলোর নাম কী?	বীজপত্র (Cotyledon)
(f) ভাগগুলোর আকৃতি কেমন?	
(g) ভাগগুলো অত মোটা কেন?	
(h)তাদের কাজ কী হতে পারে?	
(i) ভাগগুলো কোন অংশ দিয়ে একসঙ্গে আটকানো থাকে?	একটি ছোটো কবজার মতো বাঁকানো দণ্ড দিয়ে আটকানো থাকে।
(j) এই অংশটার নাম কী?	ভ্রূণাক্ষ (Tigellum)
(k)এই অংশটার ওপরের আর নীচের প্রান্ত দুটোকে কী বলে?	ভ্রূণমুকুল (Plumule) ভ্রূণমূল (Radicle)
(l) এই অংশটার মাঝখানে যেখানে বীজের ভাগগুলো আটকানো আছে, সেই জায়গাটার নাম কী?	পর্বসন্ধি (Nodal zone)
(m) পর্বসন্ধির ওপর ও নীচের অংশকে কী বলে?	ওপরের অংশ — বীজপত্রাধিকাণ্ড (Epicotyl) নীচের অংশ — বীজপত্রাবকাণ্ড (Hypocotyl)

তাহলে বীজটা থেকে গাছ জন্মায় কী করে?

এবার তোমার লাগবে একটা ভেজানো মটর বীজের খোসা ছাড়ানো ভেতরের অংশটা, একটা অঙ্কুরিত মটর বীজের (যার থেকে একটা মোটামুটি বড়ো চারাগাছ জন্মেছে) খোসা ছাড়ানো ভেতরের অংশটা, আর একটা ছোটো চারাগাছ।

আগে মনে করে নাও, বীজের খোসা ছাড়ানো ভেতরের অংশ কোনটার কী নাম?

(1) (2) (3) (4)

ভেজানো বীজের ভেতরের অংশটার ভাগগুলো সাবধানে আলগা করো, কিন্তু সেগুলো যেন মাঝখানে লেগে থাকে। এর খোলা দিকটা ওপরে করে সামনে রাখো। তারপরে চারাগাছটা তার পাশে রাখো। এবার মিলিয়ে দেখো তো, চারাগাছের কোন অংশের সঙ্গে বীজটার কোন অংশের মিল বেশি?

চারাগাছ	বীজ
মূল	
কাণ্ড	
পাতা	
	ভেজানো মটর বীজের ভেতরের অংশটা আর অঙ্কুরিত মটর বীজের ভেতরের অংশটা তুলনা করো; কী তফাত দেখেছ? কেন এই তফাত?

বীজের ভেতরে ছোট্ট গাছটা কোথায় আছে নীচে একটা ছবি এঁকে দেখাও। ছবিটা চিহ্নিত করো। (দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমায় সাহায্য করবেন)

তাহলে এবার বীজের বিভিন্ন অংশের কাজ লেখো:

1. বীজত্বক	
2. ভ্রূণ	
3. বীজপত্র	
4. ভ্রূণমুকুল	
5. ভ্রূণমূল	

বীজ তৈরি হয় কোথা থেকে? ফুলের কোন অংশ থেকে?

এটা জানি, যে বীজ থাকে ফলের ভেতরে। মনে করে দেখো, ফল তৈরি হয় ফুলের কোন অংশ থেকে?

এবারে দেখি, ফুলের কোন অংশ থেকে বীজ তৈরি হয়। তোমার দরকার হবে একটা সাদা কাগজ, একটা সিম, মটর অথবা অপরাজিতা ফুল, তার একটা ফল, আর কাটবার জন্য একটা ব্লেড। (দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমায় সাহায্য করবেন)।

ব্লেড সাবধানে ব্যবহার করবে, হাত যেন না কাটে।

ফুলের বৃতি, পাপড়িগুলো আর পুংকেশরগুলো সাবধানে কেটে ফেলো। তারপর গর্ভাশয়টি লম্বালম্বি কাটো। কাটা ফলটাকে একইভাবে কাগজের ওপরে গর্ভাশয়টির পাশে রাখো। এবার দুটিকে মিলিয়ে দেখো। গর্ভকেশরচক্রটির কোন অংশের সঙ্গে ফলের বীজটির মিল দেখতে পাচ্ছ?

তোমার খাতায় নীচের ছকের মতো পাশাপাশি ছবি আঁকো আর লেবেল করো।

কাটা গর্ভাশয়	
কাটা ফল	

এবার দুটি পাশ মেলাও:

গর্ভাশয়	বীজ
ডিম্বক	ফল

ফুলের কোন অংশ থেকে বীজ তৈরি হয়? ....

আমরা মটর বীজের গঠন জেনেছি। সব বীজের গঠনই কী একইরকম? এসো অন্য কোনো একটা বীজের গঠন দেখি। এবারে তোমার লাগবে সারা রাত ভিজিয়ে রাখা ভুট্টা বীজ, বীজটা কাটার জন্য একটা আলপিন আর একটা ব্লেড, আর একটা সাদা কাগজ।

ব্লেড সাবধানে ব্যবহার করবে, হাত যেন না কাটে।

এবার মটর বীজের গঠন যেভাবে দেখেছিলে, সেই একইরকমে ভুট্টা বীজটার গঠন পরীক্ষা করে দেখো। (দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমায় সাহায্য করবেন)

আলপিন দিয়ে বীজের ওপরের আবরণীটা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে ফেলো। আবরণীটার নাম কী? এটির কটা স্তর আছে?	
আবরণীটার ভেতরের অংশটি সরিয়ে রাখো। এবার আবরণীটাকে সাদা কাগজটার ওপরে রাখো, আর পাশের ছকে তার ছবি আঁকো।	

তারপর আবরণীটার ভেতরের অংশটি দেখো। এর নাম কী?	
এটিকে সাবধানে সামান্য চাপ দাও; এটি কটা ভাগে ভাগ হয়ে যায়?	
বীজটাকে দাঁড় করিয়ে সাবধানে ব্লেড দিয়ে সাবধানে লম্বালম্বি কাটো। বীজের ভেতরে কোথায় ছোটো গাছটা রয়েছে দেখো। (দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমায় চিনিয়ে দেবেন।) ছোটো গাছটার নাম লেখো।	
বীজের ভেতরে ছোটো গাছটা ছাড়া বাকি অংশে কী রয়েছে?	
এটার কাজ কী?	
তারপরে এটাকে কাগজটির ওপরে রাখো, আর পাশের ছকে তার একটা ছবি এঁকে চিহ্নিত করো। এবার এটা কেমন দেখতে অল্প কথায় লেখো।	

এবার দেখি বীজটার গঠন সম্পর্কে কী কী জানলাম?

সম্পূর্ণ ভুট্টাবীজ

লম্বালম্বিভাবে কাটা ভুট্টাবীজ

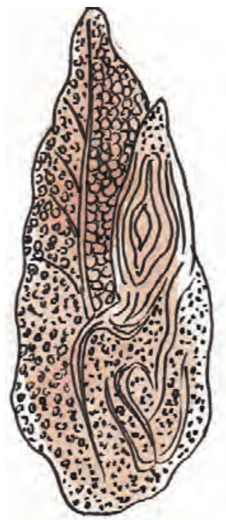

অন্তর্বীজ

প্রথমে বাইরের আবরণী:

(ক) এর নাম কী?	সংযুক্ত ফলত্বক ও বীজত্বক (United pericarp and seed coat)
(খ) এর রং কী?	
(গ) এর কটা স্তর?	দুটি স্তর; যদিও স্তর দুটিকে আলাদা করা যায় না।
(ঘ) স্তরগুলোর নাম কী কী?	ফলত্বক ও বীজত্বক
(ঙ) এর কাজ কী হতে পারে?	

তারপর ভেতরের অংশটি :

(ক) এর নাম কী?	শাঁস বা অন্তর্বীজ
(খ) এর রং কী	
(গ) এর আকৃতি কেমন?	
(ঘ) একে চাপ দিলে কটা ভাগে ভাগ হয়ে যায়?	দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় - সস্য ও ভ্রূণ
(ঙ) বীজের ভেতরে কোথায় ছোটো গাছটা রয়েছে?	ভ্রূণে
(চ) গাছটির অংশগুলো কী কী?	বীজপত্র (স্কুটেলাম) ও ভ্রূণাক্ষ
(ছ) ছোটো গাছটার পাতা কটা?	একটা
(জ) ছোটো গাছটার মূল কী দিয়ে ঢাকা?	ভ্রূণমূলাবরণী বা কোলিওরাইজা
(ঝ) ছোটো গাছটার কাণ্ড কী দিয়ে ঢাকা?	ভ্রূণমুকুলাবরণী বা কোলিওপটাইল
(ঞ) গাছটার খাদ্য কোথায় রয়েছে?	সস্যে
(ট) ছোটো গাছটা আর তার খাদ্যের মাঝখানে কী রয়েছে?	এপিথেলিয়াম স্তর

দেখো তো মটর বীজ আর ভুট্টা বীজ, দুইটি বীজের মধ্যে কী কী মিল রয়েছে?

	মটর বীজ	ভুট্টা বীজ
বীজটার বাইরে কোনো আবরণ আছে কী?		
বীজটার ভেতরে ছোট্ট চারাগাছ আছে কী?		
বীজের ভেতরে ছোট্ট চারাগাছটির খাবার রয়েছে তো?		
ছোট্ট চারাগাছটির দেহে কী কী অংশ রয়েছে?		

দুটো বীজের সবটাই কী মিল, নাকি কিছু অমিলও আছে? দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে জিজ্ঞাসা করে নাও।

	মটর বীজ	ভুট্টা বীজ
বীজটার আবরণ কী কী স্তর দিয়ে তৈরি?		
আবরণের ভেতরে ছোটো চারাগাছটা ছাড়া আর কী অংশ রয়েছে?		
ওই অংশটার কাজ কী?		
ছোটো চারাগাছটার মূল কী দিয়ে ঢাকা?		
ছোটো চারাগাছটার কাণ্ড কী দিয়ে ঢাকা?		
ছোটো চারাগাছটার বীজপত্র কটা?		
ছোটো চারাগাছটার খাদ্য কোথায় রয়েছে?		

এবার তাহলে বীজগুলো কত রকমের তা ঠিক করি। কটা বীজপত্র রয়েছে তা দেখে বীজের নাম দেব।

• মটর বীজটার বীজপত্র কটা?	
• তাহলে মটর বীজটাকে কী বলব?	
• ভুট্টাবীজে কটা বীজপত্র রয়েছে?	
• তাহলে ভুট্টা বীজটাকে কী বলব?	
• তোমার জানা মটর বীজের মতো আর কয়েকটা বীজের নাম লেখো।	
• ভুট্টা বীজের মতো আর কয়েকটা বীজের নাম লেখো।	

পরাগমিলন ও সমস্যা

নীচের প্রাণীগুলোর দিকে তাকাও। তুমি কি এদের কখনও ফুলের ওপর বসতে দেখেছ বা পরাগ ছুঁতে দেখেছ?

1 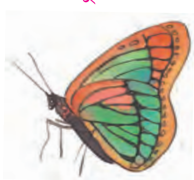

2

3

4

5

6

1\. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. ....

- আগের পাতার প্রাণীগুলো ফুলের কী সংগ্রহ করে?
- এই কাজে গাছগুলোর কী উপকার হয়?

তোমরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে/ বিদ্যালয়ের বাগানে/ বা অন্য কোনো পরিচিত বাগানে ওপরের প্রাণীগুলোর সঙ্গে কোন কোন ফুলের পরাগের সংযোগ ঘটতে পারে তার সারণি তৈরি করো।

প্রাণীর নাম	ফুলের নাম
1. প্রজাপতি	(a) উচ্ছে, কুমড়ো, ..., ...,
2. বাদুড়	(b) কদম, কাঞ্চন, কলা, ...,
3. শামুক	(c) কচু, ওল, ...,
4. পিঁপড়ে	(d) লিচু, ...,
5. মৌমাছি	(e) রাস্না, সরষে, নিম, খলসি, ...,
6. পাখি	(f) বিগোনিয়া, পলাশ, শিমুল, ...,

এই প্রাণীগুলো যে যে কাজ করতে পারে —

- একটি ফুলের থেকে পরাগরেণু সেই ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত করে।
- একটি ফুলের থেকে পরাগরেণু সেই গাছের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত করে।
- একই ফুলের থেকে পরাগরেণু ওই ধরনের অন্য গাছের ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত করে।

কোনো ফুলের পরাগরেণু যখন ওই ফুলে অথবা একই গাছের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়ে বা স্থানান্তরিত হয় তখন ওই ঘটনাকে স্বপরাগযোগ (Self pollination) বলে।

- কোনো ফুলের পরাগরেণু যখন একইরকম অন্য উদ্ভিদের ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়ে বা স্থানান্তরিত হয় তখন ওই ঘটনাকে ইতরপরাগযোগ (Cross pollination) বলে।

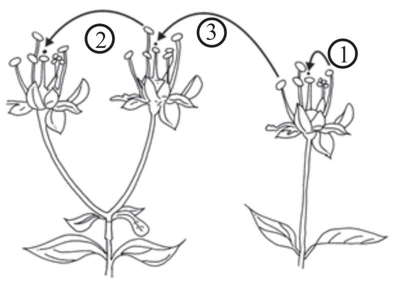

① স্বপরাগযোগ
② স্বপরাগযোগ
③ ইতরপরাগযোগ

ওপরের ছবিগুলো দেখো। এবার বলো -

1\. কোন গাছের ফুলে একই সঙ্গে পুংকেশর ও গর্ভকেশর থাকে?

2. কোন গাছের ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর আলাদা ফুলে থাকে?

ওপরের গাছ দুটির মধ্যে কোনটিতে স্বপরাগযোগ অথবা ইতরপরাগযোগ ঘটে তার নাম লেখো।

a) স্বপরাগযোগ হয় যে ফুলে

b) ইতরপরাগযোগ হয় যে ফুলে

শিয়ালকাঁটা, শিমুল, দোপাটি, অপরাজিতা, সূর্যমুখী, চাঁপা, সন্ধ্যামালতী, আকন্দ, পদ্ম, কদম, কুমড়ো, জুঁই, সরষে ও মুসাম্ভা- এই ফুলগুলোর মধ্যে কোনগুলোতে স্বপরাগযোগ বা ইতরপরাগযোগ ঘটে তা নিজেরা আলোচনা করে বা শিক্ষক / শিক্ষিকার সাহায্যে নির্দিষ্ট সারণিভুক্ত করো।

স্বপরাগী ফুল	ইতরপরাগী ফুল
শিয়ালকাঁটা, দোপাটি ......, ...,	চাঁপা, ..., ..., আকন্দ, জুঁই, ..., মুসাম্ভা, সন্ধ্যামালতী, ..., ..., ..., ...,

পরাগমিলনে সমস্যা

পোকামারার ওষুধ ব্যবহার	গাছপালা ধ্বংস	পরিবেশের উষ্ণতা বৃদ্ধি	পরিবেশের উষ্ণতা হ্রাস

ওপরের ঘটনাগুলো থেকে পরাগযোগের সমস্যা সম্পর্কে জানো।

1. বেশি পোকামারার ওষুধ ব্যবহারের ফলে মৌমাছির মতো পতঙ্গের অভাবে পরাগযোগ ব্যাহত হচ্ছে।

2. উষ্ণতার তারতম্যের জন্য ফুল ফোটার সময় পরিবর্তিত হচ্ছে। এর জন্যও পরাগযোগ ব্যাহত হচ্ছে।

3. শিমুল জাতীয় গাছ কেটে ফেলার ফলে বাদুড়ের মতো পরাগযোগের বাহকের বাসস্থান নষ্ট হচ্ছে। এরজন্য পরাগযোগ ব্যাহত হতে পারে।

তোমার অঞ্চলে কোন কোন গাছের পরাগমিলনে সমস্যা হচ্ছে তার একটি তালিকা তৈরি করো। প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষকদের বা আনাজ ব্যবসায়ীদের সাহায্য নাও।

1. পটোল
2.
3.
4.

ব্যাপন

হাতেকলমে পরীক্ষা করে দেখো:

1. একটা বড়ো ঘরের এক কোণে ধূপ জ্বালানোর পর পরই ধূপের কাছাকাছি জায়গায় যতটা সুগন্ধ পাওয়া যায় ঘরের দূরের কোণে কী তক্ষুণি ততটা গাঢ় গন্ধ পাওয়া যায়? তোমরা দেখেছ তা যায় না। ধূপ জ্বালানোর পর থেকে ধরলে সারা ঘরে তার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়তে একটু সময় লাগে, অন্তত কয়েক সেকেন্ড। ধূপ জ্বালিয়ে পরীক্ষা করে দেখো। ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ রেখো, পাখা চালিও না।

2. একটা কাচের গ্লাসে জল নাও। জলের মধ্যে সাবধানে একফোঁটা লাল বা নীল কালি ফেলে পাশ থেকে তাকিয়ে দেখো। দেখবে রঙটা ধীরে ধীরে জলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। কালির ফোঁটা ফেলার পর রংটা সবজায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ লাগছে? আধঘণ্টা? একঘণ্টা? এক ঘণ্টারও বেশি? (এই পরীক্ষা করার সময় গ্লাসটাকে নাড়ানো/জলে ফুঁ দেওয়া/চামচ ডোবানো এসব করা চলবে **না**)।

যে দুটো পরীক্ষা করলে তাতে এই হাওয়ায় সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়া আর দ্রবণে কালির রং ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে একটা মিল আর একটা অমিল নিশ্চয়ই তোমার চোখে পড়েছে। সেগুলো কী?

মিল : গন্ধ বা রং বেশি গাঢ় অংশ থেকে কম গাঢ় অংশে ছড়িয়ে পড়ছে; **অমিল :** গ্যাসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা ঘটছে অনেক তাড়াতাড়ি, দ্রবণে অনেক ধীরে।

অণুদের অবিশ্রান্ত গতির জন্য গ্যাসীয় অবস্থায় বা দ্রবণে এই বেশি গাঢ়ত্বের অংশ থেকে কম গাঢ়ত্বের অংশে পদার্থের অণুদের ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাকে বলা হয় ব্যাপন বা ডিফিউশন (Diffusion)। ওপরের উদাহরণে সুগন্ধি বা কালির রং হলো সেইসব পদার্থ যাদের অণুদের ব্যাপন ঘটছে।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষায় দেখেছেন যে :

- একই উষ্ণতায় গ্যাসীয় অবস্থার চেয়ে দ্রবণে ব্যাপন ঘটে ধীরে।
- একই উষ্ণতায়, একই মাধ্যমে হালকা অণুদের চেয়ে ভারী অণুদের ব্যাপন ঘটে ধীরে।
- তাপমাত্রা বাড়লে ব্যাপন ঘটে তাড়াতাড়ি।

ব্যাপনের আণবিক 'ছবি' :

পদার্থের বিভিন্ন ভৌত অবস্থা হলো কঠিন, তরল আর গ্যাস। এইসব অবস্থায় যে অণুরা থাকে সেকথা আমরা একটু একটু জেনেছি। পরীক্ষা করে ব্যাপনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যও আমরা লক্ষ করেছি। এই দুটোকে মিলিয়ে এবার আমরা জানতে চাইব ব্যাপনের আণবিক 'ছবি'টা কীরকম। এটা বুঝতে পাশের পাতার ছবিগুলো দেখো : এখানে জলের মধ্যে গাঢ় চিনির দ্রবণ মেশাবার পর থেকে কীভাবে চিনির অণুরা জলের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সেটা দেখানো হয়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য দ্রবণের অংশটাকে তিনটে সমানভাগে ভাগ করা হলো।

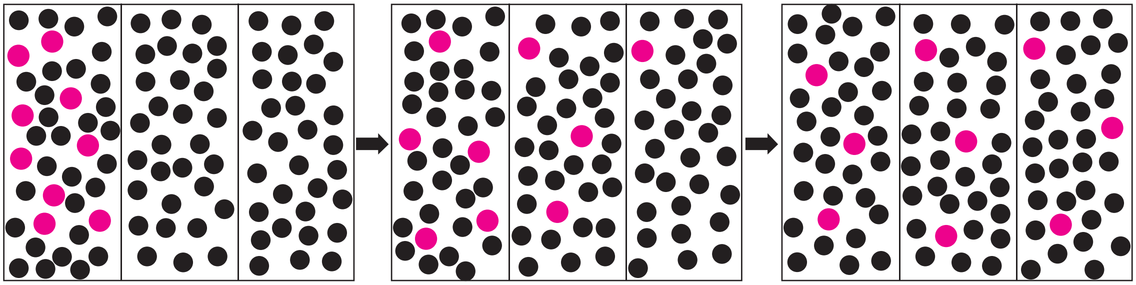

ব্যাপন সবে শুরু হচ্ছে : বাঁদিকে চিনির অণুর সংখ্যা ডানদিকের চেয়ে অনেক বেশি।

কিছুক্ষণ পর : ব্যাপনের ফলে চিনির অণুরা দ্রবণের মধ্যে কিছু দূর ছড়িয়ে পড়েছে।

অনেকক্ষণ ব্যাপনের পর : চিনির অণুরা দ্রবণের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

দৈনন্দিন জীবনে এবং জীবজগতের অন্যত্র অণুদের ছড়িয়ে পড়ার উদাহরণ :

- **পেঁয়াজ কাটার সময় চোখ জ্বালা করে;**
- **ফল কাটলে ছোটো ছোটো মাছিরা এসে ভিড় করে;**
- **ফুল ফুটলে মৌমাছিরা উড়ে আসে;**
- **ফল ধরলে রাত্রে বাদুড়রা ফল খেতে উড়ে আসে।**

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে উদবায়ী (যা সহজে বাষ্পীভূত হয়, Volatile) যৌগগুলো বাষ্পীভূত হয়। এইসব যৌগের অণুরা বাতাসের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই অণুরা খুব কম পরিমাণে থাকলেও প্রাণীদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিশেষ কিছু প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে মস্তিষ্কে গন্ধের অনুভূতি জাগে। **বাতাস বইলে গন্ধের যৌগের অণুগুলো আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে।** বিভিন্ন প্রাণীর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতা বিভিন্ন রকমের হয়।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে ফল কাটলে একরকম ছোটো ছোটো মাছিরা উড়ে আসে। আবার সন্ধেবেলায় মানুষকে কামড়াতে যে অ্যানোফিলিস মশকীরা আসে তারা কিন্তু ফল কাটলে উড়ে আসে না। কেন এরকম হয় জানো?

ফল কাটলে যেসব ছোটো ছোটো মাছি উড়ে আসে তারা হলো ড্রসোফিলা। আবার অ্যানোফিলিস মশকী হলো ম্যালেরিয়ার বাহক। **এদের ‘গন্ধ ধরার’ প্রোটিনগুলোয় তফাত আছে** — ফলের মিষ্টি গন্ধের জন্য যেসব উদবায়ী যৌগ দায়ী তাদের অ্যানোফিলিস চিনতে পারে না, ড্রসোফিলা মাছিরা পারে। আবার, মানুষের গায়ে ঘামের গন্ধে যেসব উদবায়ী যৌগ থাকে সেগুলোকে অ্যানোফিলিস মশকী চিনে নিতে পারে। তাই সন্ধেবেলায় তারা রক্তপানের উদ্দেশ্যে সেই ধরনের উৎসের দিকে উড়ে আসে।

- **সাপ কেন প্রায়ই জিভ বার করে জানো?**

বিভিন্ন প্রাণীর দেহ থেকে নানান উদবায়ী যৌগের অণু বাতাসের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সাপের জিভে সেইসব যৌগের অণুরা আটকে যায়। তারপর সাপ মুখের মধ্যে জিভটা ঢুকিয়ে নিয়ে উপরের তালুতে ঠেকায়। সেখানে থাকে একটি বিশেষ অঙ্গ। একে বলা হয় জেকবসন অরগ্যান (Jacobson Organ)। সাপ যখন জিভটা সেখানে ঠেকায় তখন সেই গন্ধের অণুগুলো মস্তিষ্কে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। সেই থেকে সাপ চারপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে জানতে পারে।

• ফেরোমোন (Pheromone)

জীবজগতে পোকামাকড়, হাতি, বাঘসহ অন্যান্য তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রাণীদের প্রজননে বিভিন্ন ধরনের উদবায়ী রাসায়নিক পদার্থের (ফেরোমোন) গুরুত্ব অপরিসীম। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কিছু প্রজাতির পুরুষ মথেরা স্ত্রী মথের দেহনিঃসৃত ফেরোমোনের গন্ধে কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেও উড়ে এসে হাজির হয়। এত কম সংখ্যক অণু থাকলেও পুরুষ মথ তা এত দূর থেকে ধরতে এবং চিনে নিতে পারে যে তা আমাদের কাছে অকল্পনীয়।

এবার ভেবে বলো তো :

- খোলা হাওয়ায় বিষাক্ত অনুদবায়ী তরল বা কঠিনের চেয়ে বিষাক্ত উদবায়ী তরল বেশি বিপজ্জনক কেন?
- অজ্ঞান করার জন্য চেতনানাশক পদার্থগুলো গ্যাস রূপে প্রশ্বাসের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় কেন?
- যক্ষ্মার জীবাণু মানুষের দেহে নানা অঙ্গে (ফুসফুস, হাড়, অন্ত্র, বৃক্ক) বাসা বাঁধে। ধরো, দুজন যক্ষ্মারোগী আছেন — একজনের দেহে জীবাণু বাসা বেঁধেছে শুধু পিঠের হাড়ের মধ্যে, অন্যজনের ফুসফুসে। কোন রোগীর দেহ থেকে যক্ষ্মা ছড়াবার সম্ভাবনা বেশি? (ইঙ্গিত : ফুসফুসে যক্ষ্মা হলে কাশি হয়।)

দৈনন্দিন জীবনে সাবধানতা :

- বাড়িতে গ্যাস লিক করলে দরজা জানালা খুলে দিয়ে হাওয়া চলাচল করতে দিতে হয়। কোনো আগুন জ্বালাতে নেই। সুইচ জ্বালানো-নেভানোও চলবে না। অবিশ্রান্ত গতির ফলে গ্যাসের অণুগুলো এখন ঘরের মধ্যে বেশ কিছু দূর ছড়িয়ে পড়েছে। সামান্য স্ফুলিঙ্গেও গ্যাসে আগুন ধরে যেতে পারে এবং বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।
- বন্ধ নর্দমা বা সেপটিক ট্যাঙ্কে বিষাক্ত গ্যাস (প্রধানত হাইড্রোজেন সালফাইড, H_2S) জমে থাকে। তাই সেখানে নামলে প্রশ্বাসের সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাস ফুসফুসে ঢোকে এবং অনেক ক্ষেত্রেই মৃত্যু ঘটায়। বহুক্ষণ খোলা রাখলে কিছুটা গ্যাস বেরিয়ে গেলেও তা নিরাপদ হয় না। এর কারণ হলো H_2S গ্যাস বাতাসের চেয়ে ভারী বলে গ্যাস অণুদের ছড়িয়ে পড়াটা ঘটে অপেক্ষাকৃত ধীরে।

হাতেকলমে নীচের পরীক্ষাগুলো করে দেখো :

(i) দুটো একই রকমের গ্লাসে একই পরিমাণ জল নিয়ে একফোঁটা করে কালি ফেলে দাও। এবার একটাকে চামচ দিয়ে নাড়ো, অন্যটা স্থির থাকুক। কোনক্ষেত্রে জলে কালির মিশে যাওয়াটা বেশি তাড়াতাড়ি ঘটছে?

(ii) ধূপ জ্বালিয়ে ঘরের পাখা চালিয়ে দাও কিংবা ঘরের জানালা-দরজা খুলে দাও। দেখো গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে পাখা না-চালানোর অবস্থার চেয়ে কম সময় লাগল কিনা।

(iii) দুটো একই রকমের গ্লাসে সমান পরিমাণ জল নিতে হবে : একটায় সাধারণ উষ্ণতার জল, আরেকটায় বেশ গরম জল। এবারে দুটোতেই একফোঁটা কালি ফেলে লক্ষ করো কোনটায় কালি তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ছে।

নীচের ছকে তোমার পরীক্ষার ফলাফল লেখো :

প্রথমবারের পরীক্ষা	দ্বিতীয়বারের পরীক্ষা	কখন কম আর কখন বেশি সময় লাগল
পাখা না চালিয়ে ধূপ জ্বালানো হলো	ধূপ জ্বালিয়ে পাখা চালানো হলো	
জল না নাড়িয়ে কালির ফোঁটা ফেলা হলো	কালির ফোঁটা ফেলে জল নাড়ানো হলো	
ঠান্ডা জলে কালির ফোঁটা ফেলা হলো	গরম জলে কালির ফোঁটা ফেলা হলো	

অভিস্রবণ

পট্যাটো চিপস কী করে তৈরি করে জানো? আলুকে পাতলা, গোল চাকতি করে কেটে নুনজলে ভিজিয়ে রাখা হয় দু-তিন ঘন্টা। এতে কী হয় বলো তো? নুনজলে রাখলে আলুর টুকরোগুলো থেকে জল বেরিয়ে যেতে থাকে :

তোমার মা কিছু কিশমিশ ভিজিয়ে রেখেছিলেন। ঘন্টাকয়েক পর তুমি দেখলে কিশমিশগুলো জল শুষে ফুলে উঠেছে :

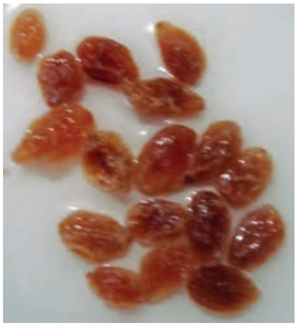

ওপরের ঘটনা দুটো পরস্পরের ঠিক উলটো : প্রথম ক্ষেত্রে বাইরে নুনের গাঢ়ত্ব বেশি ছিল তাই আলু থেকে জল বেরিয়ে গেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কিশমিশের মধ্যের দ্রবণটা গাঢ় ছিল তাই জলে ডোবাতে কিশমিশ জল শুষে নিয়েছে।

দুটো ক্ষেত্রেই কোশের পর্দার মধ্যে দিয়ে জল ঢুকছে বা বেরোচ্ছে। গ্যাস বা তরলের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন যৌগের অণুর ব্যাপনের কথা আমরা আগেই জেনেছি। এখানে জীবন্ত কোশের পর্দার মধ্যে দিয়ে ব্যাপন ঘটছে। কোশপর্দাকে আমরা প্রাথমিকভাবে অর্ধভেদ্য বলতে পারি কারণ এর মধ্যে দিয়ে জল অণুরা যেতে-আসতে পারলেও সব অণু আর আয়নরা পারে না। কোনো কোনো অণু বা আয়ন চলাচল করতে পারে বলে একে বিভেদমূলক ভেদ্য পর্দাও বলা যেতে পারে।

অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে দ্রবণে দ্রাবকের অণুদের যাওয়া-আসার ঘটনাকে বলে অভিস্রবণ বা অসমোসিস (Osmosis)। জীবকোশ ছাড়া কী অন্য কোথাও অভিস্রবণ হয় না? নির্জীব পরিবেশে তো অভিস্রবণের জন্য কোশপর্দা নেই? কৃত্রিম অর্ধভেদ্য পর্দা সেলুলোজ অ্যাসিটেট দিয়েও তৈরি করা যায়। ভেড়া, ছাগল, বাছুর ইত্যাদি প্রাণীর চামড়া দিয়ে তৈরি পার্চমেন্ট হলো প্রকৃতিজাত অর্ধভেদ্য পর্দা।

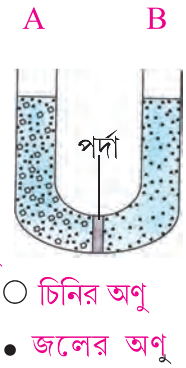

এবার আমরা একটা ছবি দেখি। একটা দু-মুখ খোলা ইউ (U) আকৃতির নলের মাঝখানে একটা অর্ধভেদ্য প্রাচীর বা পর্দা আছে। বাঁদিকে 'A' অংশে আছে গাঢ় চিনির দ্রবণ, ডানদিকে 'B' অংশে আছে বিশুদ্ধ জল। **অর্ধভেদ্য পর্দাটা এমনই যে জলের অণুরা পারলেও চিনির অণুরা তার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না।** আগে নুনজলে ভেজানো আলুর টুকরোর কী হয় তা তোমরা জেনেছ। তা থেকে বলো : পর্দার কোন দিকটা থেকে কোনদিকে জল ঢুকতে শুরু করবে?

নীচের কোন কথাটা ঠিক ঃ

1. চিনির দ্রবণে অভিস্রবণ শুরু হবার কিছুক্ষণ পর চিনির মোট পরিমাণ (মানে যত গ্রাম চিনি দেওয়া হয়েছিল) কমে যাবে, গাঢ় দ্রবণটায় জল ঢুকে পাতলা হয়ে যাবে।
2. চিনির দ্রবণে অভিস্রবণ শুরু হবার কিছুক্ষণ পর চিনির মোট পরিমাণ (মানে যত গ্রাম চিনি দেওয়া হয়েছিল) একই থাকবে, গাঢ় দ্রবণটায় জল ঢুকে পাতলা হয়ে যাবে।

তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

অভিস্রবণ কি থামানো সম্ভব?

যদি আমরা প্রথমেই চিনির দ্রবণের দিকটা (A নল) একটা পিস্টন দিয়ে বাইরে থেকে চাপ দিই তাহলে অভিস্রবণ থামানো যেতে পারে। যে ন্যূনতম (অন্তত পক্ষে যতটুকু) চাপ দিলে গাঢ় দ্রবণের দিকে জলের অণু ঢুকে পড়া থামানো যায় তাকে বলে গাঢ় দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ। চিনির দ্রবণে চিনির গাঢ়ত্ব যত বাড়বে অভিস্রবণ চাপও তত বাড়বে।

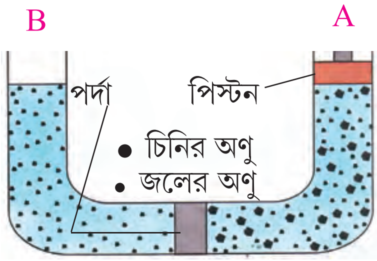

কোশ এবং তার জলীয় পরিবেশে অভিস্রবণ চাপের পার্থক্যে কী ঘটে ঃ

- অভিস্রবণ চাপ সমান এমন দুটো দ্রবণকে যদি অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে আলাদা করে রাখা হয় তাহলে সামগ্রিকভাবে কোনো ব্যাপন ঘটবে না। এর মানে জলের অণুরা কোনো দিকে বেশি পরিমাণে ঢুকতে থাকছে এমন কিছু ঘটবে না। এরকম দ্রবণকে পরস্পর **আইসোটনিক** (isotonic; গ্রিক iso = সমান) বলা হয়।

- যদি কোনো কোশের বাইরের দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ কোশের মধ্যের দ্রবণের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে? তাহলে বাইরের দ্রবণটাকে কোশের তুলনায় **হাইপারটনিক** (hypertonic; গ্রিক hyper = বেশি) বলা হবে। এক্ষেত্রে কোশ থেকে ক্রমশ জল বেরিয়ে যেতে থাকবে।

- যদি কোশের মধ্যের দ্রবণের অভিস্রাবণ চাপ বাইরের চেয়ে বেশি হয়? তাহলে বাইরের দ্রবণটাকে কোশের তুলনায় **হাইপোটনিক** (hypotonic; গ্রিক hypo = কম) বলা হবে। এক্ষেত্রে ক্রমশ বাইরে থেকে কোশের মধ্যে জল ঢুকতে থাকবে।

এবার নীচের সমস্যাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক:

- লোহিত রক্তকণিকারা যাতে অভিস্রবণ চাপের পার্থক্যে ফেটে না যায় তাই সাবধান হতে হয়। আন্ত্রিক বা কলেরা আক্রান্ত রোগীর শিরার মধ্যে নুন-গ্লুকোজ মেশানো যে জল দেওয়া হয় তার প্রকৃতি কী? [ভেবে দেখো : লোহিত রক্তকণিকার মধ্যের দ্রবণের সঙ্গে রক্ত কিরকম হলে লোহিতকণিকা ফেটে বা কুঁচকে যাবে না? হাইপারটনিক/হাইপোটনিক/ আইসোটনিক]

- যদি কলেরা-আক্রান্ত রোগীর শিরায় গাঢ় নুন জল দেওয়া হয় তাহলে রক্তকণিকার কী হতে পারে বলে তুমি মনে করো?

টুকরো কথা

গাঢ় নুনজল হলো লোহিত রক্তকণিকার সাপেক্ষে হাইপারটনিক। এই দ্রবণ মেশালে রক্তের অভিস্রবণ চাপ অনেক বেড়ে যায়। তখন রক্ত রক্তনালীর (জালকের) বাইরে থেকে প্রচুর কোশরস টেনে নেয়। এর ফলে রক্তের আয়তন ও রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং বিপদের সূচনা ঘটে।

জীবজগতে অভিস্রবণের গুরুত্ব

- গাছের মূলরোমের মাধ্যমে মাটি থেকে জলশোষণ অভিস্রবণের সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। শোষিত জল জাইলেম নলগুলো দিয়ে কাণ্ড হয়ে পাতায় পৌঁছোয়।

- ব্যাকটেরিয়া কোশের কোশপ্রাচীর সঠিকভাবে তৈরি না হলে কোশের ভিতর ও বাইরে অভিস্রবণ চাপের পার্থক্যে কোশ ফেটে যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যাকটেরিয়াঘটিত নানা রোগের চিকিৎসায় পেনিসিলিন ও সেফালোস্পোরিন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়। এইজাতীয় ওষুধের অণুরা ব্যাকটেরিয়ার কোশপ্রাচীর তৈরিতে বাধা দেয়। এর ফলে ব্যাকটেরিয়ার কোশপ্রাচীর সঠিকভাবে তৈরি হতে পারে না। তখন ভিতরের অভিস্রবণ চাপে কোশপ্রাচীর ফেটে কোশ মরে যায়।

নীচের ঘটনাগুলোকে অভিস্রবণ চাপের ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারো কী?

- রসগোল্লার গাঢ় রস সহজে পচে না।
- কাঁচা মাছে নুন মাখিয়ে রোদে রেখে দিয়ে শুঁটকী মাছ তৈরি করা হয়।
- জর্ডনের ডেড সীর জলে প্রচুর নুন আছে। এইরকম জলে কি রুই কিংবা কাতলা মাছ বাঁচতে পারে?
- মধুকে কোনো ব্যাকটেরিয়া সহজে নষ্ট করতে পারে না।

অঙ্কুরোদগম

তোমরা এর আগেই জেনেছ, যে ভ্রূণের বিভিন্ন অংশ থেকে চারাগাছের বিভিন্ন অঙ্গ তৈরি হয়। একবার মনে করে লেখো:

- চারাগাছের কাণ্ড তৈরি হয় ভ্রূণের .... অংশ থেকে।
- চারাগাছের মূল তৈরি হয় ভ্রূণের .... অংশ থেকে।

এবার কীভাবে বীজ থেকে চারাগাছ তৈরি হয় তা দেখি। তোমার দরকার হবে 5-6 টা শুকনো ছোলাবীজ, 5-6 টা ছোটো বোতলের ছিপি, ডট পেন, 1 টা আলপিন। সবমিলিয়ে সময় লাগবে 5-6 দিন।

তুমি প্রথম দিন একটা ছিপিতে জল নিয়ে তাতে একটা ছোলাবীজ ভেজাও। তার পর চারদিন একটা একটা করে ছিপিতে একটা একটা করে ছোলাবীজ ভেজাও। ষষ্ঠদিনে সবকটা ছোলাবীজের তুলনা করো।

প্রথমে এসো বাইরে থেকে দেখি :

	1ম বীজ	2য় বীজ	3য় বীজ	4র্থ বীজ	5ম বীজ
বীজটা কোঁচকানো, বা ফোলা					
বীজটা শক্ত, না নরম?					
বীজটা থেকে কিছু বেরিয়েছে?					

এবার বীজের খোসাটা আলপিন দিয়ে সাবধানে ছাড়াও। বীজপত্র দুটো সাবধানে আলগা করো, যেন দুটো পুরোপুরি আলাদা হয়ে বাইরে যায়। তারপর ভেতরটা লক্ষ করো।

	1ম বীজ	2য় বীজ	3য় বীজ	4র্থ বীজ	5ম বীজ
ভ্রূণমূলটার কী পরিবর্তন ঘটেছে?					
ভ্রূণমুকুলটার কী পরিবর্তন ঘটেছে?					
বীজপত্রে কোনো পরিবর্তন ঘটেছে কিনা?					
ঘটে থাকলে, কেন?					

তাহলে এবার বলো-

ভ্রূণমূল থেকে কী তৈরি হলো ....।

ভ্রূণমুকুল থেকে কী তৈরি হলো ....।

ছোলাবীজের বীজপত্রের কাজ কি? ....।

একটা বীজ থেকে চারাগাছ তৈরি হবার এই প্রক্রিয়াটি নামই হলো অঙ্কুরোদগম (Germination)

- কুমড়ো,তেঁতুলের বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় বীজপত্র বীজত্বক ফাটিয়ে মাটির ওপরে উঠে আসে। একে মৃদভেদী অঙ্কুরোদগম (Epigeal Germination) বলে।

- মটর, ছোলা বা আমের বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় বীজত্বকে আবদ্ধ বীজপত্র কখনোই মাটি ছেড়ে ওপরে উঠে আসে না। একে মৃদবর্তী অঙ্কুরোদগম(Hypogeal Germination) বলে।

অঙ্কুরোদগমের শর্তসমূহ

তোমরা মুদির দোকানে দেখেছ বস্তা ভরতি করে ছোলাবীজ থাকে, অঙ্কুর বেরোয় না। আবার চানা-মটরওয়ালার কাছে যে ছোলাবীজগুলো থাকে, তাতে অঙ্কুর বেরিয়ে যায়। তাহলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হতে গেলে কী কী দরকার? এসো দেখি তাই।

তোমায় জোগাড় করতে হবে গোটা দশ-বারো শুকনো ছোলার বীজ, তিনটে মাটির খুরি, খানিকটা ঝুরো মাটি, আর লাগবে জল। তোমার সময় লাগবে দিন তিন-চার।

প্রথমে খুরিগুলোতে প্রায় ভরতি করে মাটি নাও।

একটা মাটিভরতি খুরিতে তিন-চারটে ছোলাবীজ মাটির অল্প নীচে পুঁতে দাও। দ্বিতীয় একটা মাটিভরতি খুরিতে আরও তিন-চারটে ছোলাবীজ মাটির অল্প নীচে পুঁতে দাও; এই খুরিটায় ভালো করে জল দাও। তৃতীয় মাটিভরতি খুরিটায় বাকি তিন-চারটে ছোলাবীজ একেবারে মাটির নীচে পুঁতে দাও;এই খুরিটায় বেশি করে জল দাও। এবার খুরিগুলোকে তিন দিন রেখে দাও।

তিন দিন বাদে সবকটা খুরিতে ছোলাবীজগুলোকে তুলে পরীক্ষা করো। কী দেখলে নীচের সারণিতে লেখো।

	প্রথম খুরির বীজ	দ্বিতীয় খুরির বীজ	তৃতীয় খুরির বীজ
	মাটিতে জল দেওয়া হয়নি	মাটিতে জল দেওয়া হয়েছে	মাটিতে অনেক জল দেওয়া হয়েছে, বীজ মাটির অনেক নীচে ছিল
কটা বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে বীজের অঙ্কুর কতটা বড়ো হয়েছে			

এসো ভালো করে বুঝে নিই:

- কোন খুরির বীজ সবচেয়ে ভালো অঙ্কুরিত হয়েছে? ....।
- কোন খুরির বীজ একটু কম অঙ্কুরিত হয়েছে? ....।
- কোন খুরির বীজ সবচেয়ে কম অঙ্কুরিত হয়েছে? ....।
- কোন খুরির বীজ বাতাস পেয়েছে, কিন্তু জল পায়নি? ....।
- কোন খুরির বীজ বাতাস আর জল দুটোই পেয়েছে? ....।
- কোন খুরির বীজ জল পেয়েছে, কিন্তু বাতাস পায়নি ? ....।

উপরের সারণির দুটো দিক মিলিয়ে দেখো। এবার কেন এমন হয়েছে বলতে পারো?

• যে খুরির বীজ সবচেয়ে ভালো অঙ্কুরিত হয়েছে, তা কী কী পেয়েছে?	
• যে খুরির বীজ একটু কম অঙ্কুরিত হয়েছে, তা কী কী পেয়েছে, আর কী কী পায়নি?	
• যে খুরির বীজ সবচেয়ে কম অঙ্কুরিত হয়েছে, তা কী কী পেয়েছে, আর কী কী পায়নি?	

করে দেখো : থার্মোকল দিয়ে ছোটো ঢাকনাওয়ালা বাক্স বানাও। একটা খুরিতে মাটির অল্প নীচে বীজ পুঁতে জল দাও, তারপর ওই খুরিটা বাক্সটার ভেতরে রেখে ঢাকনা লাগিয়ে দাও। দিন তিনেক মাছের বাজার থেকে রোজ কিছু বরফ এনে ওই খুরিটার মাটিতে দাও। তারপর বীজটা বাক্সটার ঢাকনা তুলে দেখো, কেমন অঙ্কুর বেরিয়েছে।

কেন এমন হলো, তার কারণ বলতে পারো?

তাহলে অঙ্কুরোদগমের জন্য কোন কোন উপাদান বা শর্ত অবশ্যই প্রয়োজন?

1. 2. 3.

ওইসব উপাদান অঙ্কুরোদগমের সময়ে কী কী ভূমিকা পালন করে?

একটু মনে করা যাক :

- জল আমাদের খাদ্যবস্তুকে তরল করে, আর দেহের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায়।
- অক্সিজেন আগুন জ্বলতে সাহায্য করে, আর খাদ্যবস্তু থেকে শক্তি মুক্ত করতে সাহায্য করে।
- তাপ আমাদের জৈবনিক কাজগুলি চলতে সাহায্য করে।

এই পরীক্ষাটা আবার করো :

(a) অন্য কোনো বীজ নিয়ে

(b) পচা পাতা যুক্ত মাটি নিয়ে

(c) গোবর সার দেওয়া মাটি নিয়ে

বলো তো :

- চাষের সময়ে বীজের অঙ্কুর তাড়াতাড়ি বেরোতে গেলে কী করা যায়?
- বীজ মাটির অনেক গভীরে পোঁতা উচিত কিনা?
- বীজতলা বেশি শুকনো বা জল অনেকটা বেশি হলে কী হবে?

অঙ্কুরোদগমে ব্যাপন আর অভিস্রবণের ভূমিকা

বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটতে গেলে ব্যাপন আর অভিস্রবণ দরকার হয় কেন?

এবার এসো, বীজের অঙ্কুরোদগমের সময়ে ব্যাপন আর অভিস্রবণ কেন দরকার হয় দেখি।

ব্যাপন আর অভিস্রবণ পড়তে গিয়ে আমরা যা জেনেছি সেগুলো একটু মনে করো। যে কথাগুলো সত্যি তাদের পাশে '✓' চিহ্ন আর যেগুলো ভুল তাদের পাশে '×' চিহ্ন দাও।

1. একই উষ্ণতায় তরলের চেয়ে গ্যাসীয় অবস্থায় ব্যাপন ঘটে ধীরে। ☐
2. তাপমাত্রা কমলে ব্যাপন ঘটে তাড়াতাড়ি। ☐
3. ব্যাপনের সময় অণুরা বেশি গাঢ় অংশ থেকে কম গাঢ় অংশের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ☐
4. অভিস্রবণের সময় দ্রাবের অণুরা অর্ধভেদ্য পর্দা পেরিয়ে যেতে-আসতে পারে না। ☐
5. জলে একটুখানি গাঢ় চিনির দ্রবণ দেওয়া হলো। যত সময় যাবে চিনির অণুরা জলের মধ্যে দিয়ে ততই ছড়িয়ে পড়বে। এর ফলে দ্রবণের বিভিন্ন অংশে চিনির পরিমাণের তফাত ক্রমশ কমে আসবে। ☐

- পাশের খোপে একটা মটর বীজের ভিতরের ছবি আঁকো, যেখানে বীজটির বীজপত্র দুটি মেলে রাখা হয়েছে, আর ভ্রূণটি দেখা যাচ্ছে।
- এবার ওই ছবিতে লেবেল করে দেখাও, বীজটির ভেতরে কোথায় ভ্রূণটির খাদ্য জমা করে রাখা আছে।
- তারপরে লেবেল করে দেখাও,বীজটির কোন অংশটি বেড়ে উঠে অঙ্কুর হয়েছে।
- তাহলে কোন পথে খাদ্য তার সঞ্চয়স্থান থেকে ভ্রূণটির বাড়ন্ত অংশে পৌঁছোয় তা রেখা এঁকে বুঝিয়ে দাও।
- পাশের খোপে একটা ভুট্টা বীজের ভিতরের ছবি আঁকো, যেখানে বীজটি কেটে রাখা হয়েছে, আর ভ্রূণটি দেখা যাচ্ছে।
- এবার ওই ছবিতে লেবেল করে দেখাও, বীজটির ভেতরে কোথায় ভ্রূণটির খাদ্য জমা করে রাখা আছে।
- তারপরে লেবেল করে দেখাও, বীজটির কোন অংশটি বেড়ে উঠে অঙ্কুর তৈরি করছে।
- তাহলে কোন পথে খাদ্য তার সঞ্চয়স্থান থেকে ভ্রূণটির বাড়ন্ত অংশে পৌঁছোয় তা রেখা এঁকে বুঝিয়ে দাও।
- বলত, ওই খাদ্য কোন প্রক্রিয়ায় সঞ্চয়স্থান থেকে বাড়ন্ত অংশে পৌঁছোয়?

এবার আগে ফিরে একবার মনে করে দেখি, বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য কোন কোন উপাদান প্রয়োজন (এগুলো তোমরা কিছু আগেই পড়েছ)।

1. 2. 3.

এদের মধ্যে কোন উপাদানটি গ্যাসীয় পদার্থ, আর কোনটিই বা তরল পদার্থ?

গ্যাসীয় পদার্থ	
তরল পদার্থ	

এদের সম্পর্কে আমরা কী কী জানি? এসো নীচের ছকে লিখি :

	গ্যাসীয় উপাদান	তরল উপাদান
অঙ্কুরোদগমে কী ভূমিকা পালন করে		
কোথা থেকে বীজ পায়		
কী প্রক্রিয়ায় বীজের দেহে প্রবেশ করে		
কী প্রক্রিয়ায় বীজের দেহে ছড়িয়ে পড়ে		

তাহলে অঙ্কুরোদগমের সময়ে ব্যাপন আর অভিস্রবণ কী কী ভূমিকা পালন করে?

ব্যাপন	
অভিস্রবণ	

পরিবেশে জীবের অস্তিত্বরক্ষায় ব্যাপন ও অভিস্রবণের ভূমিকা

তোমার দেহে জলের ভাঁড়ার

দেখো তো এগুলো বলতে পারো কিনা :

- বছরের কখন তোমার বারবার তেষ্টা পায়? আর কোন সময়ে তেষ্টা পায় খুব কম? ....।
- বছরের কোন সময়েই বা তোমার ঘাম হয় খুব বেশি? আর কখন ঘাম হয় খুব কম? ....।
- ঘাম তো জলের মতো তরল। তাহলে ঘামের সঙ্গে দেহ থেকে কোন পদার্থ সবচেয়ে বেশি বেরিয়ে যায়? ....।
- এর ফলে দেহে জলের মোট পরিমাণ কমে যায় না বেড়ে যায়? ....।
- তাহলে আমাদের জানতে হবে, শরীরে জলের পরিমাণ ঠিক রাখতে হলে আমাদের কী করা দরকার।
- প্রথমে দেখি, দেহে জলের পরিমাণ ঠিক রাখা দরকার কেন।
- আমাদের দেহে জল কী কাজ করে? এসো দেখি।

তোমার খুব তেষ্টা পেলে শরীরে কীরকম অস্বস্তি হয়?

কীরকম অস্বস্তি হয়	তার কারণ কী? (মনে রেখো, তোমার রক্তের প্রায় 90 শতাংশ জল, তোমার লালারও প্রায় তাই, আর তোমার দেহের কোশগুলোর মধ্যেও প্রায় 70 শতাংশ জল)
1.	
2.	
3.	
4.	

যখন খুব ঘাম হয়, ঘাম শুকোবার পর তোমার জামায় আর প্যান্টে কীরকম দাগ পড়ে? সেটা কীসের দাগ? (দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছে জেনে নাও।) তাহলে ওই সময়ে তোমার দেহ থেকে ঘামের সঙ্গে কী বেরিয়ে যায়? ....।

- তাহলে দেখি, দেহে নুনের পরিমাণ ঠিক রাখা দরকার কেন।
- আমাদের দেহে নুন কী কাজ করে? এসো দেখি।
- অনেকক্ষণ হুটোপুটি করে খেললে তোমার শরীরে কীরকম অস্বস্তি হয়?

কীরকম অস্বস্তি হয়	তার কারণ কী? (মনে রেখো, তোমার দেহে এক শতাংশের সামান্য কম নুন থাকে।)
1.	
2.	
3.	
4.	

- ফুটবল খেলতে গিয়ে ফুটবল খেলোয়াড়দের মাঝে মধ্যে কীসে টান ধরে?
- তোমার কখনও ওই রকম হয়েছে কী?
- তাহলে, দেহে জল আর নুনের অভাব হলে আমরা তা পূরণ করি কী উপায়ে? ভেবে দেখো।
- তোমার তৃষ্ণা পেলে বুঝতে হবে, যে তোমার দেহে জলের অভাব হয়েছে; তখন তুমি কী করো?
- তুমি কি নুন ছাড়া ভাত খেতে ভালোবাসো? তাহলে সাধারণ নুনযুক্ত খাবার খেলে তোমার দেহে কী প্রবেশ করে?
- এবার তাহলে বলো, তোমার দেহে জল আর নুনের অভাব কী উপায়ে পূরণ হয় :
- জলের অভাব পূরণ করতে কী করি : ....
- নুনের অভাব পূরণ করতে কী করি : ....

- কখনও পেট খারাপ হলে, তরল মল আর মূত্রের সঙ্গে অনেক জল দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। তখন শরীরে কী কী অস্বস্তি হয়?

- তাহলে ওই সময়ে কীভাবে দেহের ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব?

ওই সময়ে এক বড়ো গ্লাস জলে তিন চামচ চিনি আর এক বড়ো চিমটি নুন মিশিয়ে নাও। এবার ওইরকম তিন গ্লাস জল সারা দিন ধরে আস্তে আস্তে খেয়ে নাও। তাহলে তোমার দেহে জল আর নুনের অভাব পূরণ করা সম্ভব হবে। এইরকম শরবতকে ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন (Oral Rehydration Solution) বা ওআরএস (ORS) বলে।

- আচ্ছা, খুব গরমে অনেকক্ষণ জল না খেয়ে থাকলে, আর খুব ঘামলে, দেহে কীসের অভাব হতে পারে?

- আগে যেমনটি দেখেছ, দেহে জল আর নুনের খুব অভাব হলে, কী কী অস্বস্তি হয়?

তাহলে ওই সময়ে মানুষ অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে; একে বলে সান স্ট্রোক। তাহলে তখন কী করতে হবে? ওই অসুস্থ মানুষটিকে শুইয়ে দিয়ে, জামাকাপড় আলগা করে দিতে হবে। তার পর তাকে ঠান্ডা জল খাওয়াতে হবে ও ঠান্ডা জলে গা ধুইয়ে দিতে হবে।

তোমার দেহে যেমন, অন্যান্য জীবের দেহেও কী জলের ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার?

এসো গাছের ক্ষেত্রে জলের ভারসাম্য কীভাবে বজায় থাকে দেখি।

বাড়িতে প্লাস্টিকের ব্যাগে মুড়ে রাখা শাকসবজি আর ফুলের প্যাকেটের ভেতরে জলকণা জমে থাকতে দেখেছ তো? ওই জলকণা কোথা থেকে আসে?

করে দেখো ও ছবি আঁকো : তোমার লাগবে দুটো টবে লাগানো ছোটো চারাগাছ, দুটো প্লাস্টিকের প্যাকেট, দু-টুকরো সুতো আর দুটো পলিথিন শিট।

একটা গাছওয়ালা টবে জল দেবে আর অন্যটায় জল দেবে না। টব দুটোকে পলিথিন শিট দিয়ে মুড়ে দাও। এবার প্লাস্টিকের প্যাকেট আর সুতো দিয়ে দুটো গাছের বিটপ অংশটা ঢেকে ফেলো। একটা গাছে জল দাও, অন্যটায় দিও না। এবার গাছদুটোকে তিন-চার ঘন্টা রেখে দাও।	
1. তারপর দেখো : প্যাকেটের ভেতরে কোন গাছটা থেকে জল বেরিয়ে গেছে?	জল দেওয়া গাছ : জল না-দেওয়া গাছ :
2. এবার দু-দিন বাদে ওই গাছদুটোকে আবার দেখো: দুটো গাছই কি সমান তাজা রয়েছে? না থাকলে গাছদুটির মধ্যে কি তফাত দেখা যাচ্ছে?	জল দেওয়া গাছ : জল না-দেওয়া গাছ :
3. তফাত থাকলে তার কারণ কী? তাহলে গাছ তার হারানো জল কোথা থেকে আর কীভাবে ফেরত পায়?	জল দেওয়া গাছ : জল না-দেওয়া গাছ :

- মাছ তো জলেই থাকে। মাছের দেহে কী হয় দেখি।

তুমি কি কখনও পুকুরের বা নদীর জল আর সমুদ্রের জল পান করেছ? পুকুর বা নদীর জল আর সমুদ্রের জলের মধ্যে স্বাদের কী ফারাক রয়েছে বলো?

এই পার্থক্যের কারণ কী?

তাহলে ওই দুরকম জলে থাকা মাছদের দেহেও কি একইরকমভাবে জল ধরে রাখা হয়? এসো জানার চেষ্টা করি।

একটা করে নদী বা পুকুরের আর সমুদ্রের মাছের নাম লেখো।

প্রথম দেখি, পুকুরের জলে পুকুরের মাছের অবস্থা কেমন হয়, আর সমুদ্রের জলে সমুদ্রের মাছের কী অবস্থা হয়। সেটা বুঝতে হলে নীচের পরীক্ষাটি করো।

করে দেখো : তোমার লাগবে ছয়-সাতটা শুকনো কিশমিশ, দুটো ছোটো গ্লাস, আর চার-পাঁচ চামচ নুন।

1. গ্লাস দুটোয় জল নাও।
   একটা গ্লাসের জলে ওই নুনটা গুলে ফেলো।
   অন্য গ্লাসটার জলে নুন দিও না।

2. প্রথমে নুন না দেওয়া গ্লাসের জলে চারটা শুকনো কিশমিশ ফেলে দাও; চারটে-পাঁচ ঘন্টা রেখে দাও।
3. মনে করো বলো তো, কেন এমন পরিবর্তন হয়েছে?
4. এবার ওই ভেজা কিশমিশগুলোর দুটো নিয়ে নুনগোলা জলের মধ্যে চার-পাঁচ ঘণ্টা রেখে দাও।
5. এবার সাধারণ জলে ভেজা কিশমিশগুলোর সঙ্গে তুলনা করে বলো তো, নুন জলে ভেজা কিশমিশগুলোর কী পরিবর্তন হয়েছে?
6. কেন আবার এমন পরিবর্তন হয়েছে বলো তো?

জেনে রেখো, পুকুরের বা নদীর মাছের দেহে যা নুন রয়েছে, পুকুর বা নদীর জলে নুন রয়েছে তার চেয়ে কম। তাহলে ওইসব মাছের অবস্থা হয় সাধারণ জলে ভেজা কিশমিশগুলোর মতো।

- বলো তো, ওইসব মাছের দেহে জলের পরিমাণের কী পরিবর্তন হয়?
- তাহলে, নিজের দেহে জলের পরিমাণ স্বাভাবিক রাখতে ওইসব মাছেরা কী করে? (তোমার শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমায় দরকারে সাহায্য করবেন।)

আবার, সমুদ্রের মাছের দেহে লবণ রয়েছে, সমুদ্রের জলে লবণ রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। তাহলে ওইসব মাছের অবস্থা হয় লবণ জলে ভেজা কিশমিশগুলোর মতো।

- এবার বলো তো, ওই সব মাছের দেহেই বা জলের পরিমাণের কী পরিবর্তন হয়?
- তাহলে, নিজের দেহে জলের পরিমাণ স্বাভাবিক রাখতে ওইসব মাছেরাই বা কী করে? (তোমার শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমায় দরকারে সাহায্য করবেন।)

এবার তাহলে নীচের ছক থেকে কোন রকমের মাছ কীভাবে নিজের দেহে জলের পরিমাণ স্বাভাবিক রাখে তা জেনে নাও :

● পুকুরের বা নদীর মাছ কী করে :	1.লঘু মূত্র ত্যাগ করে; ফলে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যায়। 2.ফুলকার মাধ্যমে জল থেকে আয়ন শোষণ করে।
● সমুদ্রের মাছ কী করে :	1.ঘন মূত্র ত্যাগ করে; ফলে খুব কম জল দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। 2.ফুলকার মাধ্যমে দেহের অতিরিক্ত আয়ন ত্যাগ করে।

শব্দভাণ্ডার : একেবারে জল খায় না; সারা দিন অনেকটা জল মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বার করে দেয়;অত্যন্ত অল্প মূত্র ত্যাগ করে; দেহ থেকে অনেকটা লবণ বার করে দেয়; জল থেকে অনেকটা লবণ টেনে নেয়।

মিষ্টি জলের মাছ

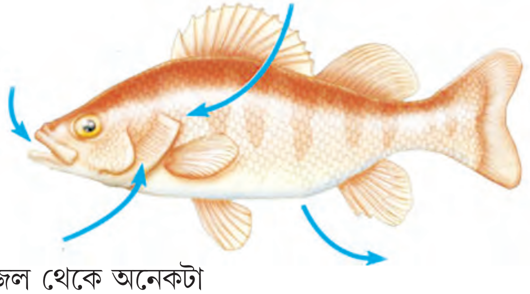

জল থেকে অনেকটা লবণ টেনে নেয়

পাশে মিষ্টি জলের ও নীচে নোনা জলের একটি করে মাছের ছবি দেওয়া আছে। ওরা কীভাবে দেহে জল ও লবণের ভারসাম্য রক্ষা করে তা ওপরের শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দ নিয়ে তিরচিহ্নের নীচে বা ওপরে লেখো (শব্দভাণ্ডারের সূত্রগুলো একাধিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারো)।

অত্যন্ত অল্প মূত্র ত্যাগ করে

নোনা জলের মাছ

7 পরিবেশের সংকট, উদ্ভিদ ও পরিবেশের সংরক্ষণ

জলবায়ুর পরিবর্তন

ওপরের ছবিগুলোতে কী ঘটেছে বলো? এর কারণ কী হতে পারে তা লেখার চেষ্টা করো।

....

....।

এসো জানার চেষ্টা করা যাক **আবহাওয়া** আর **জলবায়ু** শব্দ দুটোর অর্থ ঠিক কী?

আবহাওয়া হচ্ছে এমন একটা বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা যেখানে রোদ, ঝড়, বৃষ্টি, জল দিনে দিনে, ঘন্টায় ঘন্টায় এমনকী মুহূর্তে মুহূর্তেও বদলায়। কাছাকাছি থাকা দুটি স্থানের মধ্যেও আবহাওয়া বদলাতে দেখা যায়।

জলবায়ু হচ্ছে আবহাওয়ার দীর্ঘ সময়ের (বছর) গড় অবস্থা। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জলবায়ু দেখা যায়।

তাহলে এবারে বলো তো **আবহাওয়া** আর **জলবায়ু**-র মধ্যে পার্থক্য কী?

আবহাওয়া	জলবায়ু

আবহাওয়া আর **জলবায়ু** কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভর করে? লেখার চেষ্টা করো।

1.	4.
2.	5.
3.	6.

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো।

1. আম গাছে কখন মুকুল আসে? ....।
2. বাইরের দেশ থেকে পরিযায়ী পাখিরা কখন এদেশে আসে? ....।
3. ইলিশ মাছ কখন ডিম পাড়ে? ....।
4. পলাশ ফুল কখন ফোটে? ....।
5. এইরকম আরও কিছু প্রাকৃতিক ঘটনার কথা লেখো যেগুলো বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে হয়।
   a) c)
   b) d)
6. আমাদের দেশে বছরের কোন সময়ে বেশি গরম পড়ে? ....
7. গরম, বর্ষা, শরৎ আর শীত ছাড়া আর অন্য কোনো ঋতুর কথা কি তোমরা জানো? ....
8. বর্ষা কি বছরের নির্দিষ্ট সময়েই আসে? ....
9. তোমার অঞ্চলে শীত ঋতুর স্থায়িত্ব কত দিনের? ....

প্রতিটি ঋতুর স্থায়িত্ব স্বাভাবিক সময়ের থেকে বেশি বা কম হলে কি কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে? নীচের সারণিতে লেখো।

ঋতুর নাম	স্থায়িত্ব স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি বা কম হলে কী সমস্যা হতে পারে
1. গ্রীষ্ম	1.
2.	2.
3.	3. .
4.	4.

প্রকৃতির এই খামখেয়ালিপনা — একে এককথায় আমরা জলবায়ুর পরিবর্তনের ফল বলে ধরে নিতে পারি।

এসো এবারে তোমাদের এলাকায় এই পরিবর্তন কেমন তা খোঁজার চেষ্টা করি।

বাবা-মা বা এলাকার বয়স্কদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কর্মপত্রটা ভর্তি করার চেষ্টা করো।

কর্মপত্র

তারিখ : ....

1. আপনার নাম কী? ....

2. আপনার বয়স কত? ....

3. আপনি যে অঞ্চলে থাকেন সে অঞ্চলের নাম ও আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য কী? ....

4. আপনার অঞ্চলে ছোটোবেলার জলবায়ুর সঙ্গে এখনকার জলবায়ুর (উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি) কী কী পরিবর্তন লক্ষ করেছেন?

i) .... iii) ....
ii) .... iv) ....

5. এখনকার জলবায়ুর সঙ্গে 20 বছর আগেকার জলবায়ুর কী কী পরিবর্তন লক্ষ করেছেন?

i) .... iii) ....
ii) .... iv) ....

6. জলবায়ুর এই পরিবর্তনের পিছনে কী কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

i) .... iii) ....
ii) .... iv) ....

7. জলবায়ুর এই পরিবর্তনের ফলে কোনো শারীরিক সমস্যার কথা কী আপনার জানা আছে?

i) .... iii) ....
ii) .... iv) ....

8. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শারীরিক সমস্যা ছাড়াও আর কী কী সমস্যা আপনার এলাকায় হচ্ছে বলে আপনার মনে হয়?

i) .... iii) ....
ii) .... iv) ....

9. জলবায়ুর পরিবর্তন যাতে ভয়াবহ আকার ধারণ না করে, সেই বিষয়ে করণীয় কী বলে আপনার মনে হয়?

i) .... iii) ....
ii) .... iv) ....

পৃথিবীর ঘোমটা

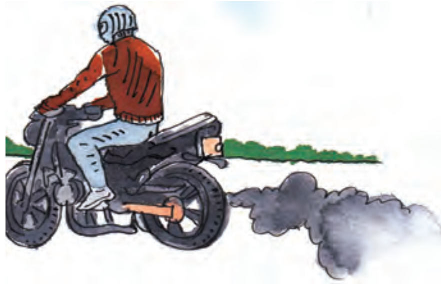

i) ওপরের ছবিগুলো থেকে কী দেখতে পাচ্ছ? ....।

ii) বিভিন্ন উৎস থেকে বেরোনো ধোঁয়া কোথায় যায়? ....।

বিভিন্ন উৎস থেকে বেরোনো এই ধোঁয়ার মধ্যে থাকে নানাধরনের গ্যাসীয় পদার্থ এবং বিভিন্ন ভাসমান কণা (Suspended particulate matter)। যেমন - কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন, সালফার ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস এবং ধুলো, কার্বন ইত্যাদির কণা। এই পদার্থগুলো বায়ুমন্ডলে গিয়ে জমা হয় আর পৃথিবীকে একটা চাদরের মতো মুড়ে রাখে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এই সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থ ছাড়াও থাকে ওজোন আর জলীয় বাষ্প।

পৃথিবীর ছেড়ে দেওয়া তাপশক্তির একটা অংশকে বায়ুমণ্ডলে ধরে রাখতে সাহায্য করে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের এই চাদর। পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে রাখার পেছনে এই গ্যাসীয় পদার্থগুলোর (CO_2, CH_4, জলীয় বাষ্প) ভূমিকা অনেকখানি। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড না থাকলে পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা $-18^{o}C$-এ নেমে যেত। তাহলে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ঘটত না। কিন্তু উলটোদিকে আবার আমাদের নানারকম কাজকর্মের ফলে পরিবেশে এইসব গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। তখন এইসব গ্যাসীয় পদার্থগুলোই প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাপকে পৃথিবীতে আটকে রাখে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায়। এটাই বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global Warming)। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে বিশ্ব উষ্ণায়নের এক গভীর সম্পর্ক আছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব

নীচে দেওয়া জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাগুলো ভালো করে পড়ো।

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি

- কিছু গ্যাস পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে স্বাভাবিকভাবে থাকে। বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে জেনেছেন যে গত কয়েক যুগ ধরে এই গ্যাসগুলো মাত্রায় অনেকটা বেড়ে গেছে।

- মানুষের বিভিন্ন কাজের ফলে সৃষ্টি হওয়া গ্যাসগুলোর মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড অন্যতম। 1970 থেকে 2004 সালের মধ্যে পরিবেশে এই গ্যাস মেশার বার্ষিক হার প্রায় 80 শতাংশ বেড়ে গেছে।

- বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা 2006 সাল থেকে এত মাত্রায় বেড়েছে যা গত কয়েক লক্ষ বছরে আর কখনোই এতটা বাড়েনি।

- 2001 সালের গোড়ায় জানা যায়, গত 100 বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে 1°C।

- মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (NASA) জানিয়েছে, 2005 সাল ছিল গত এক শতাব্দীর মধ্যে উষ্ণতম বছর।

- 1980-88 সালের মধ্যে ভারতে 18 টি তাপপ্রবাহের (Heat wave) ঘটনার কথা জানা গেছে। এরফলে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

- 2005 সালে রাজস্থানে বন্যা আর উত্তর-পূর্ব ভারতে খরা হয়। এমনিতে রাজস্থান খুব শুকনো। কম বৃষ্টিপাতের অঞ্চল। আর উত্তর-পূর্ব ভারত বেশি বৃষ্টিপাত অঞ্চল।

- 2007 সালে 4 বার মরশুমি নিম্নচাপ হয়, যা স্বাভাবিকের থেকে দ্বিগুণ। এর ফলে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালে ভয়ংকর বন্যা হয়। প্রচুর মানুষের জীবন আর জীবিকা নষ্ট হয়। একইসঙ্গে প্রায় এক লক্ষেরও বেশি মানুষ ঘরবাড়ি হারায়।

- গত 5 হাজার বছর ধরে মে মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত কাশ্মীরের অমরনাথের গুহায় জমা বরফের উচ্চতা থাকত প্রায় 12 ফুট। অথচ 2007-এ জুন মাসের শেষেই অমরনাথের ওই জমা বরফ গলে 4-5 ফুট উচ্চতার হয়েছিল।

- উত্তরাখণ্ডে 2013 সালের মেঘভাঙা বৃষ্টি থেকে বিধ্বংসী বন্যায় কয়েক হাজার মানুষ মারা গেছেন। বহু মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। বাড়িঘর আর অন্যান্য সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

হিমবাহের বরফের গলন ও নদীর জলস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি

হিমবাহকে বরফের জমাটবাঁধা নদী বললে বোধহয় খুব একটা ভুল বলা হবে না। কারণ পৃথিবীর মিষ্টিজলের বৃহত্তম ভাণ্ডার হলো এই হিমবাহগুলো। এই হিমবাহগুলোর বরফগলা জলে পুষ্ট হয় বিভিন্ন নদনদী। পৃথিবীর প্রায় 99% হিমবাহের অবস্থান উত্তর আর দক্ষিণমেরুতে। হিমালয় পর্বতমালাতেও আছে অনেকগুলো হিমবাহ।

এদের মধ্যে অন্যতম হলো গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, জেমু। গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর উৎস হলো হিমালয়ের বিভিন্ন হিমবাহ। হিমবাহের বরফগলা জলেই এরা পুষ্ট হয়। হিমালয় এশিয়ার নয়টি বড়ো বড়ো নদীকে পুষ্ট করে। এর ফলে প্রায় 120 কোটি লোকের জলের বন্দোবস্ত হয়।

গঙ্গোত্রী হিমবাহ

যমুনোত্রী হিমবাহ

জেমু হিমবাহ

বৃষ্টিপাত, বায়ুর উষ্ণতা প্রভৃতি আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তন পৃথিবীর হিমবাহগুলোর ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বেড়ে গেলে হিমবাহগুলোর বরফ বেশি মাত্রায় গলতে আরম্ভ করবে।

- গঙ্গা নদীর উৎস গঙ্গোত্রী হিমবাহ প্রতি বছর একটু একটু করে ছোটো হয়ে আসছে।
- উত্তরমেরু সংলগ্ন আলাস্কা উপকূলে যে বরফের স্তর রয়েছে, তা গত 30 বছরে 40% কমে গিয়ে পাতলা হয়ে গেছে।

হিমবাহগুলো গলে যাওয়ার ফলে সমুদ্রের জলতল বেড়ে যেতে পারে।

- 1993 থেকে 2005 সালের মধ্যে সমুদ্রের জলতল প্রতি বছরে গড়ে বেড়েছে 3 মিমি (0.1 ইঞ্চি)।
- পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের হিমবাহগুলো গলে যাওয়ার প্রভাব পড়বে সমুদ্রের জলতলের ওপর। এই বিষয়ে একটি গবেষণা বলছে যে 2100 সালের মধ্যে সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা প্রায় 70 সেমি বেড়ে যেতে পারে।

সমুদ্রের জলতল বেড়ে গেলে উপকূল অঞ্চলে বন্যার সম্ভাবনা দেখা দেবে। উপকূল অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে পড়বে। প্রাণহানি ও আর্থিক ক্ষতিরও সম্ভাবনা দেখা দেবে। সমুদ্রের জলতল বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সারা পৃথিবীতে সমুদ্রের উপকূলে বাস করা অসংখ্য মানুষ।

- ভারত ও বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলও আজ এই বিপদের সম্মুখীন। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বাঘের আবাস এই সুন্দরবন। আর এই অঞ্চলে বাস করে প্রায় চল্লিশ লক্ষ মানুষ। এদের সকলেরই অস্তিত্ব আজ সংকটের মুখে।

উষ্ণায়নের ফলে হিমবাহ পুরো গলে গেলে ভবিষ্যতে ওই হিমবাহের জলে পুষ্ট নদ-নদীর জল প্রথমে বেড়ে যাওয়ার ও পরে কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে। প্রথমে বন্যা আর পরে দেখা দিতে পারে তীব্র জলসংকট।

হিমবাহ প্রায় 80 শতাংশ সূর্য রশ্মি প্রতিফলিত করে আর প্রায় 20 শতাংশ শোষণ করে। হিমবাহ সম্পূর্ণ গলে গেলে ওই 80 শতাংশ সূর্যরশ্মি ভূভাগ দ্বারা শোষিত হয়ে পৃথিবীর উষ্ণতাকে আরও বাড়িয়ে দেবে।

প্রবাল দ্বীপ - প্রবাল প্রাচীর ধ্বংস

প্রবাল বা **কোরাল** হলো একধরনের সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এরা নিডারিয়া পর্বভুক্ত। এরা একসঙ্গে দল বেঁধে কলোনি তৈরি করে বাস করে। প্রবালরা নিজেদের দেহের বাইরে ক্যালশিয়াম কার্বনেট-এর একটা বহিঃকঙ্কাল তৈরি করে। এই বহিঃকঙ্কাল এদের দেহকে রক্ষা করে। মৃত প্রবালের সাদা বা রঙিন কঙ্কালের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে হয়। শৌখিন দ্রব্য ও গয়না হিসেবে এদের কদর পৃথিবীব্যাপী।

একসঙ্গে বাস করা অনেক প্রবালের দেহের বাইরে থাকা ক্যালশিয়াম কার্বনেটের বহিঃকঙ্কাল একটা শক্ত প্রাচীরের মতো গঠন তৈরি করে। এটাই প্রবাল প্রাচীর।

পৃথিবীর সমুদ্রতলের মাত্র 0.1% দখল করে থাকা প্রবাল প্রাচীর প্রায় 25% সামুদ্রিক প্রজাতির আশ্রয়স্থল। মাছ, মোলাস্কা, ইকাইনোডারমাটা, স্পঞ্জ, ক্রাস্টেশিয়া, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রাণী প্রবাল প্রাচীরে বাস করে। জীববৈচিত্র্যের নিরিখে প্রবাল প্রাচীরের গুরুত্ব অপরিসীম।

সমুদ্রের জলের উষ্ণতার সামান্যতম তারতম্য প্রবাল প্রাচীরের স্থায়িত্বের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

আর প্রবাল দ্বীপ কি জানো? মৃত প্রবাল আর অন্যান্য জৈব বস্তুর সাহায্যে সাধারণত প্রবাল প্রাচীরের অংশ হিসাবে **প্রবাল দ্বীপ** তৈরি হয়। ক্রান্তীয় আর উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলে সাধারণত প্রবাল দ্বীপ দেখা যায়। প্রবাল দ্বীপগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েক মিটার উঁচু হয়ে জেগে থাকে। উপকূলীয় নারকেল গাছের সারি আর সাদা প্রবালের বালি দিয়ে ঘেরা থাকে অগভীর সমুদ্রের প্রবাল দ্বীপ।

- বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর প্রবাল দ্বীপ ও প্রবাল প্রাচীরগুলো বিপন্ন হয়ে পড়েছে। 1988 সালে পৃথিবীর প্রায় 16% প্রবাল সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।
- বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে ভারত মহাসাগরে জলের উষ্ণতা বেড়ে গেছে। এই অঞ্চলের প্রবাল প্রাচীরগুলোতে বাস করে অনেক ধরনের মাছ। জলের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে এই প্রবাল প্রাচীরগুলো আর ওইসব মাছেদের আদর্শ বাসস্থান থাকছে না। লোভী মানুষও প্রবাল চুরির নেশায় এদের ধ্বংসে মেতেছে।

তোমরা তো খবরের কাগজ বা ম্যাগাজিন পড়ো। দেখো বিশ্ব উষ্ণায়ন আর জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত কী কী খবর পাও। এই বিষয়ে তোমরা যা যা পড়লে নীচের সারণিতে ছোটো করে লেখো।

বিষয়	খবর
(i) হিমবাহের গলন	
(ii) সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি	
(iii) জীববৈচিত্র্য ধ্বংস	

জীববৈচিত্র্যের সংখ্যা হ্রাস

মেরু ভালুক

এশিয়ার হাতি

বুনো কুকুর (ঢোল)

লায়ন-টেলড ম্যাকাক

লেদারব্যাক টার্টল

মাউন্টেন গরিলা

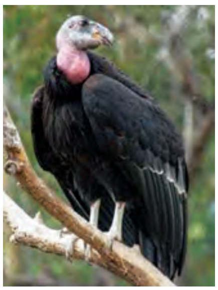

আমেরিকান কনডর

জায়েন্ট পান্ডা

আমুর লেপার্ড

গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড

অ্যাটেনবোরোস পিচার প্ল্যান্ট

পিগমি হগ

সুইসাইড পাম

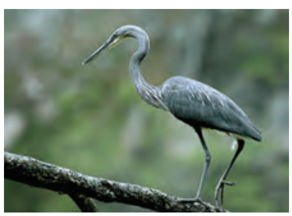

হোয়াইট-বেলিড হেরন

ব্যাক্ট্রিয়ান উট

জীববৈচিত্র্য কী ?

রেহানা সেদিন স্কুলে এসে বলল — জানিস কালকে না আমাদের বাড়ির পাশের বকুল গাছে একটা বেনে-বউ এসে বসেছিল। শ্যামল বলল — বেনে-বউ! সে গাছে উঠল কী করে?

রেহানা হোহো করে হেসে বলে উঠল — দূর বোকা! বেনে-বউ তো একটা পাখি, হলুদ রঙের, মাথাটা কালো।

শুভজিৎ বলল — ওহ! ওই পাখিটাকে তো হলুদ পাখিও বলে।

পরশু দিন রাতে অপূর্বদের বাড়ির ছাদে একটা ভাম এসেছিল। তার লাফালাফিতে ধুপধাপ আওয়াজ হচ্ছিল। আওয়াজের চোটে ওদের ঘুম ভেঙে গেল।

স্কুলের কাছে বড়ো পুকুরটার ধারে ইমতিয়াজ একটা জলের সাপ দেখছিল। সেকথা ইমতিয়াজ তার বন্ধুদের বলল। সাপটার গায়ে হলুদ রঙের উপর চৌকো চৌকো কালো ছোপ। রমেশ কাকু মাছ ধরছিল, বললেন—ঢোঁড়া সাপ, ওটার কিন্তু বিষ নেই। রেহানাদের স্কুলের কাছেই আম, জাম আর অন্য অনেক গাছের একটা ছোটোখাটো বাগান প্রায় জঙ্গলের চেহারা নিয়েছে। বন্ধুরা ঠিক করল যে এরপর থেকে তারা ওই বাগানের গাছগুলোর প্রত্যেকের নাম জানার চেষ্টা করবে। আর অন্যান্য পশুপাখিদেরও চেনার চেষ্টা করবে।

তোমার বাড়ি বা স্কুলের আশেপাশে যেসব জীবেরা থাকে তাদের একটা তালিকা তৈরি করো। এর বাইরেও কোনো জায়গায় কোনো জীবকে দেখলে তাদেরও এই তালিকায় যুক্ত করো।

বাসস্থানের প্রকৃতি	কী কী উদ্ভিদ দেখেছ (বীরুৎ/গুল্ম/বৃক্ষ)	কী কী প্রাণী দেখেছ (মেরুদণ্ডী/অমেরুদণ্ডী)
1. জলা		
2. ভিজে আল		
3. পুকুরের পাড়ের ঘন ঝোপ		
4. ইঁদুরের গর্ত		
5. পুরোনো মোটা গাছের গুঁড়ির কোটর		
6. উই ঢিপি		
7. পুরোনো বাড়ির ইটের ফাটল		
8.		
9.		

বাগান, পুকুর বা গ্রামের ঝোপজঙ্গলে রেহানারা কেউ দেখেছে কেউটে সাপ, কেউ বা দাঁড়াশ সাপ। অপূর্ব একদিন দেখল বেজির পরিবার। আর জলার ধারে শ্যামল দেখেছিল মেছো বেড়াল। ইমতিয়াজ ওর দাদুর কাছে থেকে বাড়ির পাশে ঘৃতকুমারী আর কুলেখাড়া গাছ চিনে জানতে পারল এরা একধরনের ওষধি । স্যার ওদের বললেন — এরকম অসংখ্য নাম না জানা উদ্ভিদ ও প্রাণী ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর আনাচেকানাচে। আর আছে খালি চোখে দেখা যায় না যে জীবদের — সেই জীবাণুর জগৎ। কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সব ধরনের উদ্ভিদ, প্রাণী আর জীবাণুর বৈচিত্র্য নিয়েই জীবনের বৈচিত্র্য, যাকে এককথায় বলা হয় **জীববৈচিত্র্য**। সমস্ত সৌরজগতে পৃথিবীতেই একমাত্র জীবন ও জীববৈচিত্র্য আছে। অন্য কোনো গ্রহে এখনও প্রাণের সন্ধান মেলেনি।

কোনো একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে থাকা বিভিন্ন জীব প্রজাতি ও একেকটি অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য একেক রকম। যেমন, সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য হিমালয় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য থেকে একদম আলাদা। আবার, আমাদের ভারতবর্ষের জীববৈচিত্র্য, ইংল্যান্ডের বা ব্রাজিলের জীববৈচিত্র্য থেকে অনেক আলাদা।

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল (Biodiversity Hot spot)

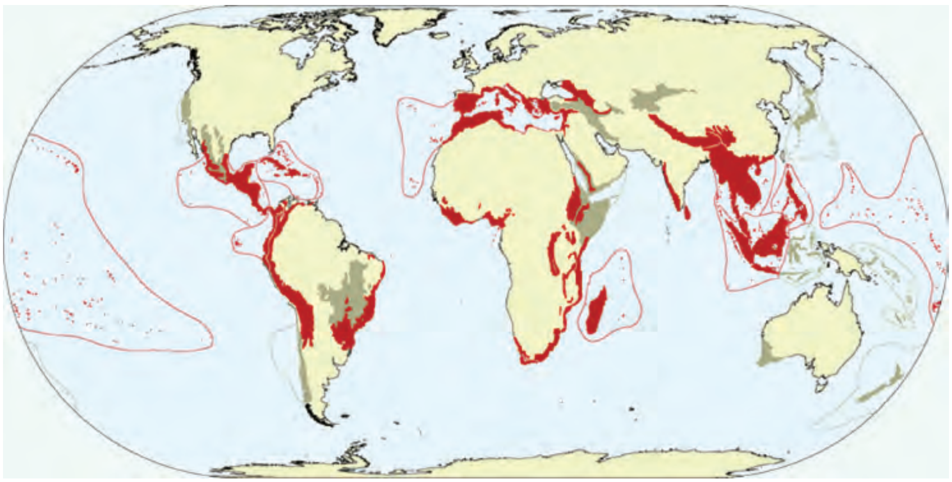

পৃথিবীতে এরকম বহু অঞ্চল আছে যেখানে খুব বেশি সংখ্যক প্রজাতির জীব পাওয়া যায়। আবার সেইসব অঞ্চলে এমন সব প্রজাতির জীবও পাওয়া যায়, যা অন্য আর কোথাও পাওয়া যায় না। সেরকম অঞ্চলকে বলা হয় জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ইংরাজিতে একে বলে বায়োডাইভারসিটি হটস্পট (Biodiversity Hot spot)। পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েকটা বায়োডাইভারসিটি হটস্পট খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।পৃথিবীর বায়োডাইভারসিটি হটস্পটগুলো ওপরের মানচিত্রে লাল রঙে দেখানো হলো। তার মধ্যে চারটি বায়োডাইভারসিটি হটস্পট হলো :

1) **পূর্ব হিমালয় (Eastern Himalayas) :** সিকিম, দার্জিলিং,ডুয়ার্স, তরাই অঞ্চল।

2) **পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং শ্রীলঙ্কা (Western Ghat and Srilanka) :** ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল বরাবর ঘন অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ি অঞ্চল।

3) **ইন্দো-বার্মা (Indo Burma) :** উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যসমূহ (যেমন-মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ)।

4) **সুন্দাল্যান্ড (Sundaland):** ভারতের আন্দামান-নিকোবর অঞ্চল।

আমাদের ভারতবর্ষের জীববৈচিত্র্যও এত বেশি যে ভারতবর্ষকে একটি অতি বৈচিত্র্যের দেশ বা মেগাডাইভারসিটি নেশন (Megadiversity Nation) বলা হয়। পৃথিবীতে এরকম আরও কয়েকটি দেশ আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, মাদাগাস্কার, ইকুয়েডর ইত্যাদি।

জীববৈচিত্র্য ও ভারত

- আমাদের দেশের জীববৈচিত্র্যের সম্ভার বিপুল। পৃথিবীর সতেরোটি অতি জীববৈচিত্র্য-সম্পন্ন (Mega Biodiversity) দেশের মধ্যে ভারত অন্যতম। এ পর্যন্ত আমাদের দেশে প্রায় 91,212 প্রজাতির বন্য প্রাণী ও পোকামাকড়, শামুক, কেঁচো ইত্যাদির খোঁজ পাওয়া গেছে।
- ভারতীয় ভূখণ্ডের আয়তন 33 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, যার মধ্যে প্রায় 19.7% বা প্রায় $\frac{1}{5}$ অংশ এলাকা অরণ্যে ঢাকা।
- সারা বিশ্বের উদ্ভিদজগতের সাত শতাংশ (7%) আর প্রাণীজগতের সাড়ে ছয় শতাংশের (6.5%) বাসভূমি এই ভারতবর্ষ। এছাড়াও আছে কয়েক হাজার জাতের দেশি ধান ও অন্যান্য ফসল, কয়েকশো জাতের দেশি গবাদিপশু। এরা সবাই আমাদের দেশের জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

জীববৈচিত্র্য থেকে আমরা কী পাই?

এই যে এতসব উদ্ভিদ আর প্রাণী — এদের কাছ থেকে কি আমরা কোনো উপকার পাই? এসো তো লিখে ফেলার চেষ্টা করি। এই তালিকায় তোমরা আরও অন্যান্য উদ্ভিদ আর প্রাণীদের নাম যোগ করতে পারো।

উদ্ভিদের নাম	উপকার	প্রাণীর নাম	উপকার
1. ধান		1.তেচোখা মাছ	
2. বট		2. সাপ	
3.নিম		3. বাদুড়	
4.		4.	

ধান

বট

নিম

জীববৈচিত্র্য অর্থাৎ বিচিত্ররকম জীবের এই সম্ভার আমাদের সবসময় নানাভাবে সাহায্য করছে। এসো এবারে দেখে নেওয়া যাক, জীববৈচিত্র্য কীভাবে আমাদের নানা কাজে লাগে। জীববৈচিত্র্যের বিভিন্ন গুরুত্বের কথা পরের দুটো পাতায় দেখানো হয়েছে। জীববৈচিত্র্যের আরও কিছু গুরুত্ব তোমরাও যোগ করতে পারো ।

খাদ্যের উৎস

1. খাদ্যশস্যের বিচিত্র সম্ভার কৃষিজ উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে।

2.

পরিবেশের দূষণ রোধ

1. অণুজীবরা বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থকে ভেঙে ফেলে ওইসব পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব দূর করতে সাহায্য করে।

2.

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব

জলবায়ুর স্থিতাবস্থা

1. পরিবেশে CO_2 পরিমাণ বাড়লে তাপমাত্রা বাড়তে পারে। একমাত্র উদ্ভিদ আর কিছু অণুজীবরাই CO_2 শোষণ করে পরিবেশে O_2- CO_2 ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে।

2. উদ্ভিদেরা মূল দিয়ে যে জল শোষণ করে, তার অতিরিক্ত অংশ বাষ্পাকারে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। বৃষ্টিপাত বজায় রাখতে বনভূমি তথা উদ্ভিদেরা এইভাবে সাহায্য করে।

3.

পরিবেশের বিভিন্ন মৌলের ভারসাম্য রক্ষা

1. মাটিতে উপস্থিত বিভিন্ন অণুজীব অন্যান্য মৃত জীবের দেহ বা বর্জ্য পদার্থগুলোকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। ফলে মাটি তার হারানো মৌলগুলোকে আবার ফিরে পায়।

2.

মৃত্তিকা সংরক্ষণ

1. ঘাসজাতীয় উদ্ভিদরা মাটির গঠন রক্ষা করতে সাহায্য করে।

2. মূলযুক্ত উদ্ভিদ মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

3. ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া মাটিতে উপস্থিত উদ্ভিদের বৃদ্ধি-সহায়ক বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ বজায় রাখতে সহায়তা করে।

4.

ওষুধের উৎস

1. সিঙ্কোনা- কুইনাইন
2. সর্পগন্ধা- রেসারপিন
3. পেনিসিলিয়াম- পেনিসিলিন
4.
5.
6.
7.
8.

কাঠ

1. জ্বালানি রূপে
2. কাগজ তৈরিতে
3.

অন্যান্য শিল্প

1. রেশম শিল্প - রেশম কীট তুঁত গাছে বাসা বাঁধে
2. লাক্ষা-শিল্প - ....
3.

জীববৈচিত্র্যের অন্যান্য গুরুত্ব

বিনোদন এবং ভ্রমণ

1. পশুপাখিদের তাদের স্বাভাবিক বাসস্থানে দেখার আনন্দ।
2. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুভব করার জন্য জঙ্গলে ভ্রমণ।
3.

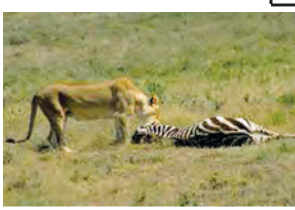

বিভিন্ন জীবদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

1. খাদ্য-খাদক সম্পর্ক
2.

শিল্প ও সাহিত্যে প্রভাব

1. কোনো কোনো গাছ ও পশু পাখি অরণ্যে বসবাসকারী আদিবাসীদের উপাস্য।
2. সাহিত্য রচনার উপাদান।
3.

নীচের কর্মপত্রটা তোমার পরিবারের বা পাড়ার কোনো বয়স্ক ব্যক্তির সাহায্যে ভরতি করো।

কর্মপত্র

তোমার নাম: স্থান: তারিখ:

1. তোমার এলাকায় আগে দেখা যেত, অথচ এখন আর দেখা যায় না, এইরকম কয়েকটা উদ্ভিদের নাম লেখো।

....

2. তোমার এলাকায় আগে দেখা যেত, অথচ এখন আর দেখা যায় না, এইরকম কয়েকটা প্রাণীর নাম লেখো।

....

3. এইসব উদ্ভিদ বা প্রাণীর হারিয়ে যাওয়ার পিছনে কী কী কারণ আছে বলে মনে হয়?

হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদ বা প্রাণীর নাম	হারিয়ে যাওয়ার কারণ
(i) বট	(i) কেটে ফেলা হচ্ছে
(ii)	(ii)
(iii)	(iii)

4. এইসব প্রাণী বা উদ্ভিদেরা হারিয়ে যাওয়ায় তোমাদের কি কোনো ক্ষতি হয়েছে? ক্ষতি হয়ে থাকলে সেগুলো কী কী? ....।

5. তোমার এলাকায় আগে দেখা যেত না, অথচ এখন দেখা যাচ্ছে এমন নতুন ধরনের কোনো উদ্ভিদ ও প্রাণী কি এসেছে? যদি এসে থাকে, তদের নাম লেখো। ....

....।

6. এই নতুন ধরনের উদ্ভিদ বা প্রাণী তোমার এলাকায় আসার ফলাফল কী হতে পারে বলে মনে হয়?

কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ এসেছে	কী ক্ষতি বা লাভ হয়েছে

7. তোমার এলাকায় কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের সংখ্যা কী আস্তে আস্তে কমছে? তাদের নাম লেখো।

উদ্ভিদ	**প্রাণী**

8. এইসব উদ্ভিদ বা প্রাণীর সংখ্যা কমার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

....।

9. তোমার এলাকার জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কী কী করা যেতে পারে নীচে লেখো।

i) iii)

ii) iv)

পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য হ্রাসের কারণ

এবার এসো আমরা জানার চেষ্টা করি আমাদের পৃথিবী গ্রহে জীববৈচিত্র্যের সংখ্যা হ্রাসের পিছনে কী কী কারণ আছে।

1. হারিয়ে যাচ্ছে বাসস্থান

প্রকৃতি থেকে জীবদের হারিয়ে যাওয়ার পেছনে একটা বড়ো কারণ হলো তাদের বাসস্থান ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

আমাদের ভোগবিলাসের সামগ্রী তৈরির প্রয়োজনে (যেমন কাঠের শৌখিন আসবাবপত্র), কখনও বা চাষের জমি বাড়ানোর জন্য, আবার কখনও বা থাকার জায়গা বাড়ানোর জন্য জঙ্গলের গাছ কেটে ফেলা হয়। এমনকি পুরো জঙ্গলও সাফ করে ফেলা হয়।

সাইবেরিয়ার বাঘের (Siberian Tiger) অস্তিত্ব সংকটের অন্যতম কারণ হলো তাদের বাসস্থান ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

জীবের থাকার জায়গা নানা কারণে ধ্বংস হতে পারে। চট করে কয়েকটা কারণ লেখার চেষ্টা করো।

জীবের থাকার জায়গা ধ্বংস হওয়ার কারণ	
1. কাঠের জন্য জঙ্গলের গাছ কেটে ফেলা।	3.
2.	4.

এমন যদি হয় কী হবে ভেবে দেখো তো

কাঠের জোগানের জন্য সুন্দরবনের পুরো জঙ্গল একদিন উধাও হয়ে গেল : ....
....।

2. অবৈধ শিকার/ চোরাশিকার

চোরাশিকারিদের লোভ অনেক প্রাণীর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে কিছু কিছু বন্য জন্তুর হাড়, চামড়া ইত্যাদি ওষুধ তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও দাঁত, চামড়া বা শিং — এসবের লোভেও বিভিন্ন প্রাণী চোরাশিকারিদের হাতে প্রাণ হারায়।

এসো তো খুঁজে দেখার চেষ্টা করি কোন কোন প্রাণী এইসব জিনিসের জন্য চোরাশিকারিদের লোভের বলি হয়।

প্রাণীদের হত্যা করে পাওয়া জিনিসের নাম	কোন কোন প্রাণী হত্যা করে পাওয়া যায়	কী কাজে ব্যবহার করা হয়	প্রাণী হত্যা না করেও কীভাবে ওই জিনিস পাওয়া সম্ভব
1. দাঁত			
2. চামড়া			
3. শিং			
4. লোম বা ফার			
5. মৃগনাভি			

এইভাবে চোরা শিকারের কবলে পড়ে গন্ডার, বাঘ, হাতি এরকম অনেক বন্য প্রাণীর সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে।

এমন যদি হয় কী হবে ভেবে দেখো তো

চোরাশিকারের ফলে একটা বনে বাঘ বা অন্য বড়ো মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যা খুব কমে গেল : ....
.... ।

3. পরিবেশে নতুন জীবের আগমন

বাইরে থেকে আসা নতুন প্রাণী অনেক সময় স্থানীয় প্রাণীদের সংখ্যা হ্রাসের কারণ হয়। যেমন বিংশ শতাব্দীতে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে বাইরে থেকে কুকুর, শুয়োর আর ছাগল নিয়ে আসা হয়েছিল। এই ছাগলরা কচ্ছপের খাবার যেমন ঘাস, পাতা খেয়ে নিত। আবার কুকুর, শুয়োরেরা খেত কচ্ছপের ডিম। ফলে একসময় দেখা গেল কচ্ছপের সংখ্যা কমে গেল। গ্রাম বাংলার জলাভূমিতে আফ্রিকা থেকে তেলাপিয়া আর বিশাল মাগুর জাতের মাছ এনে ছেড়ে দেওয়ার ফলে অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে মৌরলা, পুঁটি, খলসের মতো স্থানীয় মাছেদের।

এমন যদি হয় কী হবে ভেবে দেখো তো

একটা জলাশয়ে এমন কিছু মাছ এনে ছেড়ে দেওয়া হলো যারা অন্য ছোটো মাছদের খেয়ে নেয় : ....
.... ।

4. জলবায়ুর পরিবর্তন :

জলবায়ুর পরিবর্তন পালটে দিতে পারে জীবের চেনা পরিবেশ। আর কোনো জীব নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে না পারলে সেই জীবের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ দ্রুত গলে যাচ্ছে। আর তার ফলে মেরু ভালুকের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। বরফ গলে যাওয়ার ফলে বিপন্ন হয়ে পড়েছে এম্পারার পেঙ্গুইন, মেরু শিয়ালের মতো প্রাণীরা।

মহাসাগরের জলের অম্লত্ব ও তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে সমস্যায় পড়েছে বিভিন্ন কোরাল বা প্রবালরা।

পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে অস্ট্রেলিয়ায় ইউক্যালিপটাস গাছের পাতার খাদ্যগুণ যাচ্ছে কমে। এর ফলে সমস্যায় পড়ছে অস্ট্রেলিয়ার কোয়ালা (Koala) ভালুক - যাদের খাবার এই ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা।

এমন যদি হয় কী হবে ভেবে দেখো তো

কোনো অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ কমে গেল: ....
....।

5. পরিবেশ দূষণ

বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার অনেক সময় ডেকে আনতে পারে জীবের বিনাশ। চাষের জমিতে যথেচ্ছ কীটনাশক ব্যবহারের ফলে হারিয়ে গেছে বেশ কিছু শস্যভুক পাখি। এছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের বর্জ্য পদার্থ খাল, বিল, নদীর জলে এসে মিশছে। এর ফলে বহু মাছ ও জলজ প্রাণীর মৃত্যু হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীতে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ এসে পড়ায় প্রচুর মাছের মৃত্যুর খবর হয়তো তোমরা অনেকে পড়েছ।

শিল্প আর কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার হওয়া বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ গঙ্গায় এসে মেশে। ফলে গঙ্গায় মাছের সংখ্যা খুব কমে গেছে। সেই সঙ্গে বিপন্ন হচ্ছে গঙ্গার শুশুক (Gangetic Dolphin)।

এমন যদি হয় কী হবে ভেবে দেখো তো

নদীর জলে কলকারখানার দূষিত পদার্থ ফেলা হলো : ....
....।

6. অতিরিক্ত অর্থনৈতিক ব্যবহার

কোনো বিশেষ উদ্ভিদ বা প্রাণীর অর্থকরী গুরুত্ব যদি খুব বেশি হয়, তবে অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ওইসব জীবের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

হিমালয়ের কস্তুরী মৃগ (Musk Deer) হলো এরকমই এক প্রাণী। এদের থেকে পাওয়া যায় মৃগনাভি। আর এই মৃগনাভি থেকে তৈরি হয় নানা সুগন্ধি দ্রব্য। মানুষের সুগন্ধি দ্রব্যের প্রতি আকাঙ্খা মেটাতে গিয়ে এই প্রাণীর অস্তিত্ব আজ সংকটের মুখে।

এসো এবারে লিখে ফেলি অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে এমন কোন কোন জীবকে আমরা খুব বেশি মাত্রায় আমাদের কাজে লাগাচ্ছি।

জীবের নাম কী	কী কী প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়

এমন যদি হয় কী হবে ভেবে দেখো তো :

গাছের কোনো অংশ থেকে ওষুধ তৈরি হয়, এমন গাছকে বেশি মাত্রায় কাজে লাগানো :...........
....।

পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্য হ্রাস

গত 500 বছরে 784 টি প্রজাতি পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যাদের মধ্যে আছে 338 টি মেরুদণ্ডী প্রজাতি, 359 টি অমেরুদণ্ডী প্রজাতি ও 87 টি উদ্ভিদ প্রজাতি । গত 20 বছরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে প্রায় 27 টি প্রজাতি।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রায় 15,500 টি প্রজাতি ধ্বংসের মুখে।

যে জীবগুলি পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে তাদের কয়েকটি হলো :

বাংলার বাঘ

বাংলার শকুন

একশৃঙ্গ গন্ডার

গঙ্গার শুশুক

চিতা

শিম্পাঞ্জি

ওরাং ওটাং

গিংকো

গরিলা

বর্জ্য ও মানব স্বাস্থ্যের ঝুঁকি

1. ....

2.........................

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

ওপরের ছবিগুলিতে কোন কোন উৎস থেকে বর্জ্য বেরোচ্ছে তা ছবির নীচে উল্লেখ করো।

ওপরের ছবিগুলিতে থাকা বিভিন্ন বর্জ্যের উৎস প্রকৃতি ও উপাদান উল্লেখ করো।

ক্রমিক নং	বর্জ্যের উৎস	বর্জ্যের প্রকৃতি (কঠিন/তরল/গ্যাসীয়)	বর্জ্যের উপাদান
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

ওপরের ছবিগুলো থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বিভিন্ন বর্জ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছ। এবার তোমার এলাকার বর্জ্য মানচিত্র তৈরি করো।

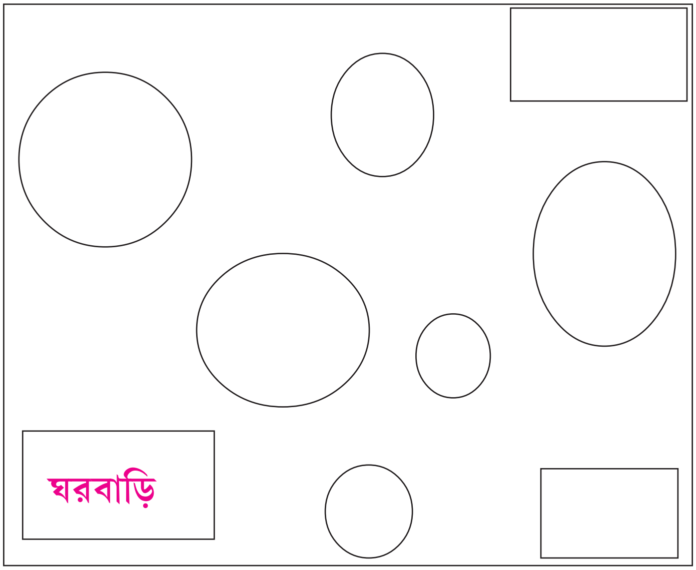

- বিদ্যালয়
- চালকল
- পুকুর
- চাষের ক্ষেত
- হাসপাতাল
- বাজার
- খেলার মাঠ
- বাসস্ট্যান্ড
- ঘরবাড়ি

ওপরের বিভিন্ন উৎস থেকে কী কী বর্জ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় তার তালিকা ও প্রকৃতি নির্ণয় করো।

উৎস	বর্জ্যের নাম	বর্জ্যের প্রকৃতি
1. বিদ্যালয়		
2. চালকল		
3. পুকুর		
4. চাষের ক্ষেত		
5. হাসপাতাল		
6. বাজার		
7. খেলার মাঠ		
8. বাসস্ট্যান্ড		
9. ঘরবাড়ি		

ওপরের বিভিন্ন উৎস থেকে যে সব বর্জ্য নির্গত হয় তার মধ্যে কতকগুলো মানব শরীরের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। মলমূত্রের মাধ্যমে জীবাণুরা পানীয়জল বা খাদ্যের উৎসে মিশলে এবং পরবর্তী সময়ে সুস্থ মানবশরীরে প্রবেশ করলে নানারকমের রোগের প্রকাশ ঘটে।

রোগগুলো হলো :

1. বাহক (মশা, মাছি, ইঁদুর, ..., ...) দ্বারা সংক্রামিত রোগ — ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু, ডায়ারিয়া, প্লেগ, ..., ...।

2. হাসপাতালে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিত্যক্ত বা রোগীর ব্যবহৃত উপাদান দ্বারা সংক্রামিত রোগ — হেপাটাইটিস, ..., ..., ...।

3. কলকারখানা থেকে নির্গত বিভিন্ন অপরিশোধিত যৌগ বা ধাতু থেকে সংক্রামিত রোগ — ক্যানসার, স্নায়ুরোগ, হাড়ের যন্ত্রণা, চর্মরোগ, ..., ...।

এবার তোমার চেনা পরিচিত অথবা কোনো প্রতিবেশীর দেহে এমন কী কোনো সমস্যা রয়েছে? খুঁজে দেখে নীচে লেখো :

তিনি কোথায় কাজ করেন	কী কারণে হয়ে থাকতে পারে	সমস্যাটি কী	কী করণীয়
1. অ্যাসবেস্টসের কারখানায়	অ্যাসবেস্টস	ফুসফুসের সমস্যা	ডাক্তারেরপরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন
2.			
3.			
4.			

তাহলে এই সকল রোগ আর ঝুঁকির জন্য আমাদের কী কী অসাবধানতা আর অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস দায়ী তা চিহ্নিত করো।

রোগ/ ঝুঁকি	কারণ	কোন অসাবধানতা/ অস্বাস্থ্যকর আচরণ দায়ী	কী করা দরকার
হেপাটাইটিস	পানীয় জলে ভাইরাসের সংক্রমণ	দূষিত জল পান করা ...., ...,	জল ফুটিয়ে খাওয়া,

পরিবেশ রক্ষায় গাছের ভূমিকা

পরিবেশ দিবস পালন উপলক্ষ্যে পীযূষদের স্কুলে এবার আলোচনার বিষয়-পরিবেশ রক্ষায় গাছের ভূমিকা। সে উপলক্ষ্যে ছেলেমেয়েরা নানা ছবি এঁকে এনেছে।

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ওপরের ছবিগুলো দেখিয়ে স্যার বললেন— তোমার জীবনে গাছের ভূমিকা কী কী হতে পারে তা নীচে লেখো।

গাছ না থাকলে কী হয়	গাছ থাকলে কী হয়
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

সিধু একটা বইতে সে দিন পড়ল আমাজন নদীর দু-পাড়ের মাইলের পর মাইল ঘন জঙ্গল নাকি রাবার চাষের জন্য কাটা পড়ছে। বিজ্ঞানীরা এজন্য খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। একথা বলায় স্যার বললেন, গাছ ছাড়া আমরা বাঁচার কথা ভাবতেও পারি না। এসো এবার আমরা আলোচনা শুরু করি গাছ পরিবেশ রক্ষায় কী কী ভূমিকা পালন করে।

বায়ুমণ্ডল ও গাছ

সূর্যের আলো পেলে গাছের সবুজ পাতার পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। আর তা দিয়ে প্রবেশ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। সূর্যের আলো, জল আর কার্বন ডাইঅক্সাইড কাজে লাগিয়ে গাছ খাদ্য তৈরি করে নিজে পুষ্ট হয়। আজ থেকে প্রায় 350 কোটি বছর আগে, পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির প্রথম দিকে, বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ ছিল খুব কম। আনুমানিক 250 কোটি বছর আগে প্রথমে কিছু অণুজীব সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে অক্সিজেন তৈরি করতে শুরু করে। আরো অনেক পরে গাছ সালোকসংশ্লেষের ফলে প্রচুর O_2 গ্যাস ছাড়তে শুরু করলো। সালোকসংশ্লেষের সময় অণুজীব ও গাছেরা শোষণ করতে শুরু করল CO_2। এতে বাতাসের উপাদানের পরিমাণ ধীরে ধীরে বদলে গেল। তবে সবধরনের উদ্ভিদের CO_2 শোষণ ক্ষমতা সমান নয়।

টুকরো কথা

কানাডার সরলবর্গীয় প্রাচীন বনভূমিতে খুব কম পরিমাণে CO_2 শোষিত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে একই ঘটনা ঘটে। কিন্তু ইউরোপ, চিন বা সাইবেরিয়ার নতুন তৈরি বনভূমিতে ঠিক তার বিপরীত ঘটনা ঘটে। বায়ুতে CO_2 -এর ঘনত্ব যত বাড়ছে এসব অরণ্যের গাছরাও অতিরিক্ত CO_2 শোষণের জন্য নিজেদের বদলে নিচ্ছে। বিদেশে ওক, বার্চ কিংবা মেপল গাছে শীতের শেষে নতুন পাতা গজানোর সময় প্রায় 20-25 দিন এগিয়ে এসেছে। আর শেষপাতা ঝরে পড়ার সময়ও প্রায় 10-12 দিন পিছিয়ে গেছে। ফলে এরা আরও বেশিদিন ধরে CO_2 শোষণ করতে পারছে।

যে পাতার ক্ষেত্রফল যত বেশি তার CO_2 গ্যাস শোষণের হার তত বেশি। নীচের গাছগুলোর মধ্যে কোন কোন গাছের পাতা একটা নির্দিষ্ট সময়ে বেশি CO_2 গ্যাস বাতাস থেকে নিতে পারে বলে তুমি মনে করো? (তেঁতুল, শাল, কাঁঠাল, ধান, আখ, আলু, বট, কদম, ছাতিম, পাইন, গরান, ঘাস)

গাছ ও প্রাণীর নির্ভরশীলতা

পৃথিবীতে মোট জীবের প্রায় 99% হলো উদ্ভিদ। আর মাত্র 1% হলো প্রাণী। সবুজ গাছপালা খাদ্যে যে পরিমাণ শক্তি জমিয়ে রাখে, তার 10-20% শক্তি প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখতে ব্যয় হয়। অরণ্য যদি কমতে থাকে তাহলে এসব প্রাণীর বেঁচে থাকার শক্তিতেই টান পড়বে। আজকের পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে তিন লাখ জাতের উদ্ভিদবৈচিত্র্য দেখা যায়। আর প্রাণীবৈচিত্র্য হলো প্রায় দশ লাখের মতো। এর মধ্যে প্রায় সাত লাখ প্রাণীর খাদ্য হলো গাছপালার নানা অংশ বা সম্পূর্ণ গাছ।

তোমার জানা নীচের প্রাণীগুলো কীভাবে অরণ্যের উদ্ভিদের ওপর খাদ্যের বিষয়ে নির্ভরশীল তা নীচের তালিকাতে উল্লেখ করো :

প্রাণীর নাম	কী খায়, আর তা কোথা থেকে পায়	সারাবছর একই পরিমাণ খাদ্য পায় কি?	উৎসগুলো নষ্ট হলে ভবিষ্যতে প্রাণীগুলো কী হতে পারে?
হরিণ			
হাতি			
একশৃঙ্গ গন্ডার			
বাদুড়			
কাঠবিড়ালি			
ধনেশপাখি			
লালপান্ডা			

গাছ ও খাদ্য-খাদক সম্পর্ক

অরণ্যে সূর্যের আলো ব্যবহার করে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে। আর নানা অঙ্গে তারা খাদ্য সঞ্চয় করে। এই সঞ্চিত খাদ্য নানা প্রাণী ব্যবহার করে। তাই অরণ্যে উদ্ভিদরা হলো উৎপাদক আর প্রাণীরা হলো খাদক। খাদ্য-খাদকের এই সম্পর্কটাই হলো খাদ্যশৃঙ্খল। অরণ্য যতো বড়ো হয়, অরণ্যে গাছপালার যত বৈচিত্র্য বাড়ে তত নতুন নতুন খাদ্যশৃঙ্খল তৈরি হয়। আর একটা খাদ্যশৃঙ্খল অন্যান্য খাদ্যশৃঙ্খলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে তৈরি করে খাদ্যজাল।